প্রসন্নকুমারের

উইল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উপহার।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় বি, এল,

দাদা মহাশয়, শ্রীচরণকমলেষু।

দাদা,

তুমি যে যোগেনকে একদিন ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে তোমার নিকট বর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া এখন বর্ণযোজনায় সক্ষম হইয়াছে; এমন কি গত বিশ বৎসরে কুড়িখানি গ্রন্থরচনাও করিয়াছে, এবং প্রতিদিনই কত সংবাদ ও সাময়িক-পত্রের অঙ্গ কাল করিতেছে। কিন্তু এ সকলের মূল তুমি। এখন তোমার স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম প্রথম ফল সুস্বাদু হয় না বলিয়াই, এতদিন তোমায় সে ফল প্রদান করিতে পারি নাই। কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। টক্‌ই হউক, আর মিষ্টই হউক, স্বহস্তরোপিত বৃক্ষের ফল মনে করিয়া এইটি গ্রহণ কর।

৬ নং রামহরি ঘোষের লেন,
কলিকাতা।
১০ই আশ্বিন, ১৩০৬ সাল।

তোমারই স্নেহের
যোগেন।

গ্রন্থকারের

অন্যান্য পুস্তক।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।
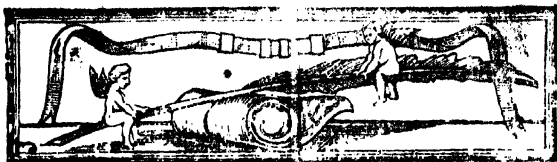
প্রসন্নকুমারের উইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সারি-সারি-সারি—শিবপুর গ্রামের চৌধুরীপাড়ার রাস্তা দিয়া রমণীকুল চলিয়াছে—সারি—সারি—সারি। কেহ অবগুণ্ঠনবতী, কেহ বা কেবল অবনতমুখী, সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা এক এক জন স্ত্রীলোক। এইরূপ দলে দলে বহু-সংখ্যক রমণী, আপন আপন বালক বালিকা লইয়া—কেহ ক্রোড়ে, কেহ বা সঙ্গে—ঐ পাড়ার ডাক্তার অভয়চরণ চৌধুরীর অন্দর-মহলে প্রবেশ করিতে লাগিল। বেলা তিনটার মধ্যে, অভয় বাবুর সেই বিস্তীর্ণ অন্দরমহল, বালক-বালিকাসহ রমণীকুলে একবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আজ অভয় বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। সেই কারণ, গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছে। চৌধুরী পাড়ার মধ্যে অভয় বাবু একজন সম্ভ্রান্ত-লোক; তাহার উপর, তিনি মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ এক জন বহুদর্শী এবং বিজ্ঞ ডাক্তার; সুতরাং তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, গ্রামের

উচ্চে অম্লচ্চে, হাসিতে কান্নাতে—এই সুন্দরী-রাজ্যে কি এক অপূর্ব্ব কোলাহল উত্থিত হইতেছিল !

একে একে সকল বাড়ীর সকল স্ত্রীলোকই উপস্থিত হইল। পরিশেষে, সুন্দরীযুবতীগণের মধ্যে, সামান্য বস্ত্রালঙ্কার-পরিহিতা এক মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমা আসিয়া, অতি ধীরে ধীরে পৌঁছিল। অবগুণ্ঠনে, সে প্রতিমার বিষাদময়ী সুন্দর মুখখানি অর্দ্ধাবৃত ছিল, সুতরাং প্রথমে কেহ কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে প্রমীলাসুন্দরী এক জন। প্রমীলা গ্রামের কুলবধূ; সুতরাং তাহার সকলকে চিনিবারও সম্ভাবনা ছিল না। নবাগন্তুককে দেখিয়া, প্রমীলা, তাহার পার্শ্ব-বর্ত্তিনী চারুবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, —"ঠাকুর-ঝি, ঐ বউটি—কে ভাই ?"

চারুবালা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল, —"চিন্‌তে পার নাই ? ঐ সেই প্রসন্ন ঠাকুরদাদার ভাগ্‌নে-বউ, যার স্বামী আজ দশ বৎসর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।"

প্রমীলা।—ঠাকুরদাদা মর্‌বার সময় সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি সেই ভাগ্‌নের নামে উইল ক'রে গেছেন নয় ?

চারুবালা।—হাঁ। এখন ওর স্বামীরই তো সব হয়েছে। ঠাকুরদাদার বিষয়-সম্পত্তি কম নয়। শুনেছি—তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাকার বিষয় রেখে গেছেন।

প্রমীলা।—আচ্ছা, তাঁর কি কোন ছেলে মেয়ে নাই ? ভাগ্‌নের নামে উইল কেন করে গেল ভাই ?

চারু।—ছেলে নাই, এক অবীরা বিধবা মেয়ে আছে। ঐ যে সেই মেয়ে—মুক্তপিসী, দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বাবার কাছে

শুনেছি—বিধবা মেয়ের ছেলেপিলে না থাক্‌লে, বিষয় অধিকারী হয় না। ছেলের অবর্ত্তমানে, ভাগ্‌নের ই বিষয়ের অধিকারী হয়। তবে আর এক ভাগ্‌নে আছে কিনা—তাহা উইল ক'রে, এই ভাগ্‌নেকেই সমস্ত বিষয় দিয়ে গেছেন। আমার বাবা সেই উইলের একজন স্বাক্ষী আছেন। আর, এখন ডাক্তার কাকা আর উনিই তো ওদের সব বিষয়-আশয় দেখেন।

প্রমীলা।—আচ্ছা, তোমার মুক্তপিসীর মুখ খানা অমন কেন ভাই?

চারু।—কে জানে ভাই? সকলে বলে—ঠাকুরদাদার মরবার সময়, মুক্তপিসীকে অনেক নগদ টাকা দিয়ে গিয়েছেন। সেই টাকার গর্ব্বতে নাকি, পিসীমার মুখখানা ক্রমে অমন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা নইলে, আগে মুখের অমন ভাব ছিল না।

প্রমীলা।—বউটির নাম কি?

চারু।—নির্ম্মলা।

প্রমীলা।—তা নির্ম্মলাই বটে। বাপের বাড়ী কোথায়?

চারু।—নিকটেই—এই রাজে-শিবপুরে।

প্রমীলা।—আচ্ছা, ঠাকুর-ঝি—ওর স্বামী বিবাগী হয়ে গেল কেন ভাই?

চারু।—আহা! সে বড় দুঃখের কথা। ঠাকুরদাদার অনেক টাকা-দামের একটা হীরার আংটী নাকি চুরি যায়; সে আংটী তাঁর হাতবাক্সেই থাক্‌ত। যে দিন চুরি যায়, সেই দিন, সেই বাক্সের চাবি, তিনি, ওর স্বামী নগেন-কাকার কাছে, কি কাজের জন্য একবার দিয়েছিলেন। তাই, নগেনকাকার উপর তাঁর সন্দেহ হয়। সে

জন্য, নগেন-কাকাকে তিনি খুব ভর্ৎসনা করেন। নগেন-কাকা সে রকম লোক নন। তিনি, অভিমানে আর মনের দুঃখে, সে জন্য বাড়ী থেকে বিবাগী হ'য়ে চলে যান। শেষে, তাঁর বাড়ীতে যে আর একজন ভাগ্‌নে ছিল, সেই সুরেশ-কাকাই আংটি চুরি করে রেখে ছিল; বেচ্‌তে গিয়ে, ধরা পড়ে গেল। তখন, ঠাকুর দাদার আপ্‌শোষের আর সীমা রইল না। আর ঠাকুরদাদা বড় একরোকা লোক ছিলেন; কোনরূপ অন্যায় চ'ক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। একজন নিরাপরাধ লোক—এই জন্য বিবাগী হ'য়ে গেছে ব'লে, অপরাধীকে তিনি তখনই বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলেন। সুরেশ-কাকার সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু নগেন-কাকার সংবাদ, সেই থেকে আর পাওয়া যায় নাই।

প্রমীলা।—বউটি, সেই মনের দুঃখে বুঝি, ভাল গহনা-কাপড় আর পরে না? তা নইলে অত বড়লোকের বউ, তার ভাল গহনাকাপড় কি আর নেই?

চাপা।—তা নয় তো কি? আর খুড়ীমাকে কখন কোথাও নিমন্ত্রণ যেতেও দেখি নাই। তবে এই ডাক্তার-কাকার বাড়ী—না এলে নয়, তাই বোধ হয়, এসেছেন। আহা! খুড়ীমার যে রূপ ছিল, সে রূপ কি আর আছে? বয়স বেশী নয়, আমরা সমবয়সীই হ'ব। তা আমরাও ওঁকে কখন কোনরকম আমোদ-আহ্লাদ কর্‌তে দেখি নাই।

প্রমীলা।—ওঁর স্বামী যখন বিবাগী হয়, তখন ওঁর বয়স কত হয়েছিল?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চারু।—বয়স আর কত হবে? সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে। বয়স তখন বড়জোর দশ বৎসর।

প্রমীলার সহিত চারুবালার এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় স্ত্রীলোকগণের আহারের পাতা-প্রস্তুত-সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত হইল। সৌদামিনী, বিনীতভাবে, সকলকে আহার-স্থানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সুতরাং উভয় যুবতীর কথোপকথন বন্ধ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকদিগের আহারের স্থান, ছাদের উপর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নিমন্ত্রণের দিবসে ছাদের উপর তিন-চারি শত স্ত্রীলোকের আহারের আয়োজন। শ্রেণীর পর শ্রেণী—একরূপে কদলীপত্র ও গেলাস-বাটি সাজান হইয়াছে। বালক বালিকাগণ, দৌড়াদৌড়ি করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিল। প্রাচীনা বিধবারাও, তৎপরে আসিতে ত্রুটি করিল না। কেবল অবগুণ্ঠনাবৃতমুখী কুলবধূগণ, মন্দমন্দে আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, সমস্ত আহারের স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলের বসিবার স্থান-সন্ধান হইলে পর, মল্লবেশধারী পরিবেশন-কারিগণ, বড় বড় লুচির ধামা-হস্তে দেখা দিল। প্রত্যেকের পশ্চাতেই তরকারীর মালসাধারী এক এক জন সহচর। দুপ্‌দুপ শব্দে প্রতি পাতায় লুচি পড়িতেছিল; কিন্তু পড়িতে না পড়িতে, অমনি সে সকল লুচি অদৃশ্য হইতে লাগিল!—লুচিবিহীন কদলী পত্রের উপর কেবল লুচির চিরসুহৃদ তরকারী মহাশয় প্রভুবরের বিরহ সহ্য করিতে লাগিলেন! প্রথম দফায়, যে যাহা পাইল, তাহা বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিল। দ্বিতীয় দফায় আহার আরম্ভ হইল। প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোকগণ, তত্ত্বাবধান-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের তত্ত্বাবধান, কেবল আপনাপন পরিবারস্থ রমণীগণ মহলে পর্য্যবসিত হইতেছিল। তবে বহুমূল্য অলঙ্কার ও বস্ত্রালঙ্কৃত রমণীগণও যে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের বহির্ভূত

ছিল না, এরূপ কথা কখনই বলিতে পারিব না। নানারূপ তরকারীর সহিত যখন লুচির কাণ্ড শেষ হইয়া গেল, তখন মিঠাই ও সন্দেশের সরা বাহির হইল। প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া সরা প্রদত্ত হইতে লাগিল। প্রথম দফার লুচির ন্যায়, ঐ সরাদ্বয়ও, প্রদত্ত হইবামাত্র, কোন এক মোহিনী শক্তিবলে, অদৃশ্য হইতে লাগিল। যে যত পারিল, এইরূপে এক একটি পুঁটুলি বাঁধিল। তাহার পর, দধি, ক্ষীর ও পুনরায় সন্দেশের হাঁড়ি বাহির হইল। যাহারা মিষ্টান্ন পুঁটুলি বাঁধিয়াছিল, এইবার তাহারা মিষ্টান্নের সাধ মিটাইল। পুনরায়, পরিবেশনের সহিত সন্দেশ প্রদত্ত হইলে পর, রমণীকুল, পাতে সন্দেশ দিবার সময়, বাম হস্ত বাড়াইতেও ত্রুটি করিল না! সর্ব্বশেষে, সৌদামিনী, প্রত্যেক পাতার নিকট গিয়া, কাহার কি আবশ্যক—জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের ভোজে সুখ্যাতি লাভ করা—বড় অল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম নয়। কিন্তু সেদিন সৌদামিনীর অদৃষ্টে তাহা ঘটিল। তবে সে সুখ্যাতি যে, সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছিল, এরূপ অসম্ভব কথা আমরা কখনই ঘোষণা করিতে পারিব না। যে বিধবার দৌহিত্রের সন্দেশের সরার আটটী সন্দেশের মধ্যে একটির চতুর্থাংশের এক অংশ ভগ্ন ছিল, সেই বিধবা, তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা অন্য এক বিধবাকে কহিল,—"ও মুক্তকেশী, তোমাদেরও বাড়ীতে তো পাঁচটা ক্রিয়া-কর্ম্ম দেখেছি; কিন্তু এমন বে-বন্দোবস্ত তো কখন দেখি নাই! সকলকে তো সমানভাবে দিতে হয়। আমরা গরীব বলেই কি এই রকম করতে হয়? লোকের যে হাঁসের পালের মত ছেলে খেতে বসেছে! তা' আমার পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঐ একটু শিবরাত্রের শল্‌তে; তার পাতেই

কি না—একটা ভাঙা সন্দেশ! আমার অদৃষ্ট দেখ্‌, মা, আমার অদৃষ্ট দেখ্‌।"

মুক্তকেশী, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"নির্ধনীর ধন হ'লেই ঐ রকম ব্যবস্থা হয়। তুই দেখিস্‌—এ ধূমধাম চিরকাল থাক্‌বে না। বলি, জমিদারী তো আর নাই। ডাক্তারীতে এ ধূমধাম, আর কতকাল চল্‌বে? মেয়ে-খাওনাতে আমার বাপের উপর টেক্কা দিতে যায়! আমাদের বাড়ীতে একখানা ক'রে সরা হয়, এ আবার দুখানা ক'রে সরা? দর্পহারী ভগবান আছেন; এ দর্প —থাক্‌বে না, থাক্‌বে না। আমার বাপের খেয়ে মানুষ; এখনও তাঁর বিষয়াশয়ের কি করছেন, তা ভগবানই জানেন। এত লুচি-সন্দেশের ছড়াছড়ি—এত বাড়াবাড়ি, আমি বামুনের মেয়ে হই তো, কখনই সবে না—সবে না—সবে না।"

প্রৌঢ়া বিধবা, তাদের মুখে অমনি সুর ধরিল,—"কালী মুখুয্যে —পোড়ার মুখো—চোখে দেখ্‌তে পায় না গা? আমারই নাতির পাতে ভাঙা সন্দেশের সরা! আমার নাম ক্ষীরী বাম্‌নী; এর জন্যে আমি মিত্তের বাড়ী ব'য়ে ঝগড়া করে আস্‌বো। তার সাত গুষ্টির—"

তখন, ক্ষীরোদাসুন্দরীর কথায় বাধা দিয়া, মুক্তকেশী কহিল,—"সৌদামিনীর অহঙ্কার দেখেছিস্‌? যেন অহঙ্কারে আজ আর তাঁর মাটিতে পা পড়ে না! মাগী যেন ষাঁড়ের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। একে দিচ্ছেন, তাকে দিচ্ছেন—যেন ধরাখানা সরার মতন দেখেছেন! শীগ্‌গীর পতন হবে—শীগ্‌গীর পতন হবে।"

পুনরায় তাল ফাঁক্‌ পাইয়া, ক্ষীরোদাসুন্দরী আরম্ভ করিল,—

"ছেলের অন্নপ্রাশন দিতে বসে, এমন মনোকষ্ট কি কাউকে দিতে আছে গা? সবাই নিমন্ত্রণে এসেছে--সবাই সমান। এর ভিতর যিনি ইতর-বিশেষ কর্‌বেন, ভগবান তার বিচার অবশ্যই কর্‌বেন। এ কেবল, আমরা দুঃখী বলে, আমাদের ডেকে এনে অপমান করা বৈ তো নয়।"

উপরোক্ত কথা-কয়েকটি বলিয়া, ক্ষীরোদা, আপনার বুকে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল,—"আমার বড় কঠিন প্রাণ, তাই এত অপমান সহ্য হ'ল! আমি তেমন কুলে মেয়ে নই, তাই এই নিয়ে এত লোকের মাঝখানে কোঁদল কর্‌লেম না! কামিনীর মা হলে, এতক্ষণ ঝমাঝম্ কোঁদল লেগে যেতো।"

মুক্তকেশী।—ডাক্তারের আক্কেলখানা দেখেছ? একবার খাওয়ান দেখ্‌তেও এলো না! আমি বল্‌ছি—তুই পাড়ায় পাড়ায় খুব নিন্দে করে বেড়াবি। আর সন্ধ্যার পর, আমার বাড়ী যাস্; তোর নাতির জন্য আমি এক সের ভাল সন্দেশ দেবো।

ক্ষীরোদা।—তোমাদেরই খেয়ে মানুষ মা, তোমাদেরই খেয়ে মানুষ। তা' তোমাদের চাকর-নফরে সন্দেশ আনে; সন্দেশ যে আন্‌তে যাবে, তাকে বাজারের গোপাল ময়রার দোকান থেকে ভাল কাঁচা গোল্লা আন্‌তে ব'লো—আমার নাতি সেই কাঁচা গোল্লা খেতে বড় ভালবাসে। আমি গ্রামময় গাবিয়ে বেড়াবো—ডাক্তারের ছেলের অন্নপ্রাশনের শ্রাদ্ধ কর্‌বো—তার সুখ্যাতির মুখে ছাই দেবো।

এই সময়, মেয়েদের আহারের শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে, বিধবাদের মিষ্টালাপও বন্ধ হইয়া গেল। যে-যাহার লুচি-মিষ্টান্নের পুঁটুলী বগলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কি অপূর্ব্ব শোভা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

৺ প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী—শিবপুরের চৌধুরী-পাড়ার প্রায় মধ্যস্থলেই। বাড়ীর সম্মুখেই—লৌহ-রেল-পরিবেষ্টিত একটী সুন্দর উদ্যান। এ উদ্যানের—এখন আর কেহ সে রূপ যত্ন করে না। প্রশস্ত রাজপথের উপরেই একটী সুন্দর গেট; গেটের দুই ধারের দুইটি স্তম্ভ—অতি সুন্দর। সেই স্তম্ভদ্বয়ের উপর নহবৎখানা স্থাপিত। গেট হইতে লালবর্ণের দুইটী সুর্‌কীর রাস্তা, দুই দিক হইতে চক্রাকারে গিয়া, সেই অট্টালিকার গাড়ী-বারাণ্ডার নিম্নে গিয়া মিলিয়াছে। উদ্যানের দক্ষিণাংশে—ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণী-পরিশোভিত একটী সুন্দর সুদীর্ঘ পুষ্করিণী। সোপানশ্রেণীর উপরিভাগে—বেদিকা-পরিবেষ্টিত নাতিদীর্ঘ চত্বাল। পুষ্করিণীর চারিধারে—নানাজাতীয় দেশীবিলাতী পুষ্পবৃক্ষ সুসজ্জিত—এখন যত্নাভাবে সেরূপ প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশিতে আর সুশোভিত হয় না। ঘাটের দুই দিকে দুইটী প্রস্তর-নির্ম্মিতা স্ত্রী-মূর্ত্তি; উলঙ্গিনী বলিয়া, লজ্জায় যেন আকুঞ্চিতা হইয়া রহিয়াছে। ঠিক গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখে, উদ্যানের মধ্যস্থলে, একটী লৌহ-নির্ম্মিত কৃত্রিম ফোয়ারা। তাহারও দুই-তিনটী স্তবক। এখন যেরূপ ধূলাবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, অনেক দিন হইতে সে আপন কার্য্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ফোয়ারার দুই পার্শ্বে—দুইটী সমুন্নত 'অর্‌কেরিয়া' বৃক্ষ; —গোলাকার সবুজ ঘাসের ক্ষেত্র। সফোয়ারা বৃক্ষ-দুইটী

থাকে। ভৃত্যগণের গৃহ ও এই বৈঠকখানার মধ্যবর্ত্তী স্থানে—দ্বিতলে উঠিবার সুরম্য সিঁড়ি। উপরেও একটী সুসজ্জিত বৈঠকখানা, একটী ইংরাজী ফ্যাসানে সজ্জিত 'হল' ঘর প্রভৃতি ছিল; কিন্তু সে সকল ঘর, এখন আর ব্যবহার হয় না, সকলগুলিই চাবিবদ্ধ। সদর বাড়ীর দ্বিতলের গৃহগুলি, একবারেই নীরব ও নিস্তব্ধ। কেবল বারাণ্ডায় একটা কাকাতুয়া, অতি কর্কশ ক্যা ক্যা-রবে, সেই নিস্তব্ধতা মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ করিয়াথাকে।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে অন্দরবাটী। অন্দরেও, উভয় তলে অনেকগুলি গৃহ। দ্বিতলের গৃহগুলি প্রায়ই শয়ন-গৃহ। তাহার মধ্যে তিন চারিটী গৃহ বিশেষরূপে সুসজ্জিত। নিম্নতলের গৃহগুলি, রন্ধন ও ভাণ্ডার-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন দুই তিনটা গৃহ, দাসীগণের শয়ন-গৃহরূপেও ব্যবহৃত হইত। এখন, দাসীমধ্যে এক কামিনী ভিন্ন আর কেহ নাই।

অন্দরে পূর্ব্বে অনেকগুলি জ্ঞাতি-কুটুম্বের স্ত্রীলোকগণ বাস করিত; কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার কন্যা মুক্তকেশী ও ভাগিনেয়-বধূ নির্ম্মলা ভিন্ন আর কেহ নাই। নির্ম্মলাও অনেক সময় তাহার পিতৃগৃহে থাকিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার উইলে স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছিলেন,—"আমার পরিবারস্থ জ্ঞাতিকুটুম্ব-আত্মীয়গণ পূর্ব্বে যেরূপ ভরণপোষণ পাইয়াছেন, আমার অবর্ত্তমানেও সেইরূপ ভরণপোষণ পাইবেন।" কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার কন্যা মুক্তকেশীর মুখের চোটে, কেহ আর তিষ্ঠিতে পারিল না; যে যেখানে পাইল, অন্যস্থানের জন্যে প্রস্থান করিল! আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রীবিয়োগ

য়। কিন্তু তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর; সুতরাং তিনি আর অন্য দারপরিগ্রহ করিলেন না; তাঁহার দুই মৃতা ভগিনীর যে দুইটী পুত্র ছিল, তাহাদের লালন-পালনেই বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যা মুক্তকেশী— বাল-বিধবা, সুতরাং সেই হতভাগিনী কন্যাকেও তিনি বিশেষ যত্ন করিতে কোন মতে ত্রুটি করিতেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয়দ্বয়—নগেন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্র—প্রায় সমবয়স্ক ছিল, এবং উভয়ের আকৃতিতেও অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হইত। তবে নগেন্দ্রনাথ সচ্চরিত্র, মেধাবী ও বিনয়ী ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের প্রকৃতি, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; কিন্তু সুরেশচন্দ্রের বাহ্য আকারে বা ব্যবহারে, তাহার কুচরিত্র ও উদ্ধত স্বভাবের বিষয় কেহ জানিতে পারিত না। উভয়েই অতি শৈশবকাল হইতে একত্র একইভাবে লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে রোপিত একই বীজ, বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া, যেমন ভিন্নরূপ ফল উৎপাদন করে, উভয়ের লালনপালন ও শিক্ষার ফলও সেইরূপ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছিল। তবে সুরেশচন্দ্র বড়ই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ও কৌশলী বলিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় এক জন বিচক্ষণ লোকও, তাহার প্রকৃত চরিত্র জানিতে পারেন নাই। যে দিবস অপহৃত অঙ্গুরী বেচিতে গিয়া সুরেশচন্দ্র পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে আনীত হইল, সেই দিন তিনি তাহার অসচ্চরিত্রের কথা প্রথম জানিতে পারিলেন; এবং পূর্ব্বেও অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরি যে তাহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল, তখন তাহা বুঝিতে

পারিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই দিন নগেন্দ্রনাথের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব্বে কেহ কখনও তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখে নাই। তিনি, সংবাদপত্রে নগেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান-কারীকে এক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং তাহার আকৃতিরও যথাযথ বর্ণনা ছাপাইলেন; কিন্তু তথাপি কেহই নগেন্দ্রনাথের অনুসন্ধান দিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ, সুরেশচন্দ্রকে পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পর যে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, এক দিনের জন্যও ব্রাহ্মণ সুখী হইতে পারে নাই; বিশেষতঃ, নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী নির্ম্মলাকে দেখিলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ ফাটিয়া যাইত।

সুরেশচন্দ্র, অবিবাহিত অবস্থায়ই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয়; সুতরাং সে বিষয় ব্রাহ্মণ এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ যত দিন জীবিত ছিলেন, নির্ম্মলাকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। নির্ম্মলাও, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া, অনেক সময় স্বামীর কথা পর্য্যন্তও ভুলিয়া যাইত; সেই কারণ, মৃত্যুকালীন উইলে এরূপ কথাও লিখিয়া ছিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে তাঁহার ভাগিনেয় আর গৃহে ফিরিয়া না আইসে, অথবা ঈশ্বর না করুন, নিরুদ্দেশ অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে নির্ম্মলাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে এবং দত্তক-পুত্রও গ্রহণ করিতে পারিবে। এই কারণ, নির্ম্মলার প্রতি মুক্তকেশীর হিংসার সীমা ছিল না। এই উইলের জন্য মৃত পিতাকেও গালি দিতে সে ত্রুটি করিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্দরের পশ্চিমে নানা ফল-ফুল ও শাক্‌সব্জীর একটী বাগান ছিল। সে বাগান, অন্দরের অন্তর্ভূত বলিয়া, উচ্চপ্রাচীরে বেষ্টিত। সে বাগানের মধ্যে যে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাহাকে সকলে খিড়কীর পুষ্করিণী বলিত। বাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া, একটী গলির রাস্তা। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মালী থাকিবার জন্য একটি খড়ের ঘর। চারি পাঁচ জন মালীর মধ্যে এক ভেকুরাম উড়ে মাত্র অবশিষ্ট আছে। ভেকুরাম, যে সময়ে যে শাক-সব্জী, সেই বাগানে কেবল তাহারই চাস করিয়া থাকে। বাগানের উত্তরাংশে—অপেক্ষাকৃত এক অত্যুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত গোলাবাড়ী। এইখানে ধান্য, চাউল, দাইল, [illegible] [illegible], সরিষা ইত্যাদি শস্য গোলাজাত হয়। এই সকল শস্য জমীদারী হইতে আনীত হইত। গোলাবাড়ীর এক পার্শ্বে, একটা ঢেঁকীশালাও ছিল। ঢেঁকীশালার পূর্ব্বাংশে ভিয়ানের ঘর। এই ঘরে, ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। খিড়কীর পুষ্করিণীর উত্তরাংশে—ঘর-কয়েক কৈবর্ত্তের বাস। তাহারা, মুখুয্যেদের রেয়তি প্রজা। এই পুষ্করিণীর দুই দিকে—দুইটি ঘাট। এক ঘাট—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ ব্যবহার করে; অপর ঘাটটি পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণের ব্যবহারার্থ তিনি প্রস্তুত

করিয়া দিয়াছিলেন। উচ্চপ্রাচীর-বেষ্টিত বলিয়া এই পুষ্করিণী পাড়ার স্ত্রীলোকগণের বড় প্রিয় ছিল। অনেকেই এই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে ও বাসনাদি মাজিতে আসিত। তাহাদের যাহা কিছু সভাসমিতি, সকলই এই স্থানে হইত। ইহা, একপ্রকার স্ত্রীলোকগণের একটি ক্ষুদ্র পার্লিয়ামেণ্ট বলিলেও বলা যায়। পাড়ার স্ত্রীলোকগণের বক্তৃতার ইহা একটি লীলাভূমি। প্রাতে ও বৈকালে অনেক স্ত্রী-বাগ্মীর বক্তৃতায় এই স্থান কম্পিত হইত। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার স্ত্রীমহলের অনেক কোন্দলেরও সূত্রপাত এই স্থান হইতে হইত। ডাক্তার বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশনের পর দিন প্রাতে, এই পুষ্করিণীর ঘাটে পাড়ার স্ত্রীমণ্ডলের নিয়মিত সমাবেশ হইয়াছিল। আজিকার স্ত্রীলোকগণের আলোচ্য বিষয়—সেই ডাক্তার বাবুর মেয়ে-নিমন্ত্রণ।

কামিনীর মা কহিল,—"এমন মেয়ে-খাওয়ান, আমার বয়সে কখনও দেখি নাই। যে যা চেয়েছে,সেই তা পেয়েছে। মেয়েরা যেমন পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছে,তেম্‌নি আঁচলপূরে বেঁধে নিয়ে এসেছে। ছোট-বড় এক্‌সাট সবাইকে সমান দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারের স্ত্রীও খুব লক্ষ্মী মেয়ে; সকলকে আদর-যত্নও যথেষ্ট করেছে। আমাদের তো সেই আদর-যত্নেই পেট ভরে গিয়েছিল; তা আর খাব কি? যত পেরেছি, বেঁধে এনেছি।"

চারুবালা কহিল,—"তা ঠান্‌দিদি, নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে অত বেঁধে আনা কিন্তু ভাল হয় নাই। আমার শ্বশুর-বাড়ীর দেশে, মেয়েরা লুচি-সন্দেশ বেঁধে আন্‌লে, বড় নিন্দে হয়।"

ঠান্‌দিদি তখন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"সে কি লো! মেয়েরা খেতে গিয়ে বেঁধে আন্‌বে না? সে আবার কি রকম মেয়ে খাওয়ান? ওপারে কল্‌কেতাতেও তো নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখেছি—সব মেয়ে লুচি-সন্দেশ বেঁধে নিয়ে যায়। কল্‌কেতার চেয়েও তোর শ্বশুরবাড়ী বড় সভ্য-সহর নাকি?"

চারু।—আমার শ্বশুরবাড়ী জয়নগর। সে কি আর কলকেতার মতন সভ্য-সহর? তবে সেখানে ঠান্‌দিদি, এদেশের মতন, মেয়েরা নিমন্ত্রণে গিয়ে বেঁধে আনে না; আর পায়ে হেঁটেও কারু বাড়ী নিমন্ত্রণে যায় না। তা জয়নগরের চেয়েও তো শিবপুর সহর গ্রাম; এখানে কিন্তু সে রকম রীতি নাই।

ঠান্‌দিদি।—তা না থাকে, নাই থাক্‌লো। আমাদের অভয় ডাক্তার প্রাতঃবাক্যে চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাকুক, সৌদামিনীর ছেলের কোলে আবার ছেলে হ'ক। বেশ খাইয়েছে—খুব দিয়েছে।

এমন সময় বামহস্তে-স্থাপিত কতকগুলি বাসন ডান-হস্তে ধরিয়া, বাসনের ঠন্‌ঠন্‌ শব্দ করিতে করিতে, ক্ষীরোদাসুন্দরী সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিতে আসিতেই, সৌদামিনীর মার কথা-কয়েকটি তাহার কর্ণে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং আসিয়াই, সুর টানিয়া ক্ষীরোদা আরম্ভ করিল, —"আশীর্ব্বাদের ঘটা দেখে আর বাঁচি না। বেশ খাইয়েছে —খুব দিয়েছে! ভালখাকিদের কি চোখ ছিল না? আমার নাতির সন্দেশের সরা দেখ্‌বার সময়, তাদের চ'খে কি আগুণ লেগে গিয়েছিল?"

সেই ঘাটের সকল স্ত্রীলোকই ক্ষীরোদাসুন্দরীকে চিনিত; তাহার মতন কোন্দলকারিণী সে অঞ্চলে আর দ্বিতীয় ছিল না; সেই কারণ, সকলেই তাহাকে ভয় করিত। ক্ষীরোদা, কামিনীর মাকে স্পষ্ট গালি দিলেও, কামিনীর মা, সে গালির প্রতি কোন লক্ষ্য না করিয়া, কহিল,—"তোর নাতির সন্দেশের সরায় কি হয়েছে, ক্ষীরোদা?"

ক্ষীরোদা।—আমার কি হবে? কালী মুখুয্যে-পোড়ার মুখোর বুকে আমি ভাতের হাঁড়ী উলিয়েছিনুম কি না, তাই আমারই নাতির সরায় আধখানা সন্দেশ!

তখন, কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা চারুবালাও সেই ঘাটে উপস্থিত। চারু-বালা, তাহার পিতাকে স্পষ্টাক্ষরে এইরূপ অন্যায় গালি দিতে দেখিয়া, কি রূপে তাহা সহ্য করিতে পারে? সুতরাং চারুবালা কহিল,—"কেন ক্ষীরো মাসী, তুমি মিছেমিছি বাবাকে গাল দাও? যদি না দেখতে পেয়ে একটা ভাঙ্গা সন্দেশই তোমার নাতির সন্দেশের সরায় পড়ে থাকে, সে কথা তাকে বল্‌লেই তো তুমি আর একখানা সরা পেতে।"

ক্ষীরোদা।—ওলো, তোর বাপ যত দেউনী, তা কালই জানা গেছে। হত-ছাড়া মিন্সের পেছু পেছু ঘুরে বেড়ালুম—মুখ-ফুটে একখানা সরাও চাইলুম—তা সে যে পরের ধন, তা দিতে বুক চড়্‌চড়্ করে যে! আমার মনে যে দুঃখ দিয়েছে যদি ভগবান থাকেন, তাকে নিশ্চয়ই মনোদুঃখ পেতে হ'বে। আমি ক্ষীরী বাম্‌নী, আমার কথা ফল্‌বেই ফল্‌বে। তেরাত্রি যাবে না—তেরাত্রি যাবে না।"

তখন চারুবালার আর সহ্য হইল না; চারুবালা ক্রোধভরে

কহিল,—"আমার বাপকে বিনাদোষে যে গাল দেবে, তার মুখের গাল বুকে পড়্‌বে। ভদ্রলোকের মেয়ে হ'য়ে, একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—"

চারুবালার মুখের কথা, মুখেই রহিল। কারণ, তখন রঙ্গিনীমূর্ত্তিতে ক্ষীরোদা দিগ্‌দিগন্তর কম্পিত করিয়া আরম্ভ করিল,—"ওলো ভালখাকী, সর্ব্বনাশী, আঁটকুড়ীর ঝি, তোর এত স্পর্দ্ধা!—তুই আমার সামনে আমাকেই গালি দিস্! ভগবান এর বিচার করবে—তোর মুখে কুষ্ঠ মহাব্যাধি হবে—তুই বিনা দোষে আমায় যেমন গাল দিলি, তেরাত্রি যাবে না, তোর বাপটা মরে যাবে—তুই বাপ-ভেয়ের মাথা খাবি—আমার মতন রাঁড় হবে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে ক'রে বেড়াবি।"

ক্ষীরোদাসুন্দরীর এইরূপ অজস্র গালিবর্ষণে যেন একটা তুফানের ঝড় বাতাস আরম্ভ করিল। তখন তাহার সেই বিকট চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় কোন্দলের সংবাদ ছড়াইল। ঘাটে যে সকল স্ত্রীলোক ছিল, ভয়ে তাহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। চারুবালাও আর সেখানে থাকিতে সাহস করিল না। বিশেষ আবশ্যক থাকিলেও, আর কেহই সে সময় সে পুষ্করিণীতে আসিতে সাহসী হইল না। কেবল আসিল—আমাদের মুক্তকেশী। মুক্তকেশী, ক্ষীরোদাসুন্দরীর গলার শব্দ পাইয়া, তাড়াতাড়ি খিড়কীর পুষ্করিণীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই, ক্ষীরোদা কাঁদিয়া ফেলিল; এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"এই দেখ্ মা, ভালখাগীদের আস্পর্দ্ধা দেখ্; তোদের খিড়কীর পুকুরে আসি বলে, আমার অপমানটা একবার দেখ্।"

মুক্তকেশী, আপনার মুক্তকেশগুচ্ছ শ্রীমুখ হইতে সরাইয়া কহিল,—"তোকে কে কি বলেছে, ক্ষীরোদা পিসী ?"

তখন ক্ষীরোদার বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। ক্ষীরোদা, ক্রন্দনের মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া কহিল,—"আবার কে বল্‌বে —আর কার এতদূর বুকের পাটা হবে ?—সেই পোড়ারমুখো কালী মুখুয্যের আঁটকুড়ির ঝি চেরো পোড়ারমুখী। গাল বলে গালমা! বলে কিনা—'আমার মুখের গাল বুকে পড়্‌বে!' আমার মুখের গাল—তাদের সাতগুষ্টির বুকে পড়ুক। আমি গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিতে পারি। আমায় কিনা—যাচ্ছে-তাই গাল!"

মুক্তকেশী যেন বিস্মিত হইয়া কহিল,—"তাই তো! আচ্ছা, কিসের দরুণ ঝগড়া বাধ্‌লো ?"

ক্ষীরোদা।—ওমা, কোন দোষ নাই মা—কোন দোষ নাই! সেই তো কাল অত রাত্রে তোমার কাছ থেকে সেই সন্দেশ-কটা নিয়ে ঘরে তো গেলুম। রাস্তায় যেতে যেতে, কি মনে হলো— তাই মা, গোলকো-মুদীর দোকানে ওজন ক'রে দেখলুন। ওজন ক'রে দেখি—এক সেরের যায়গায় তিন পোয়া বৈ নয়!' যা হোক মরুগ্‌গে — এতে তোমার আর দোষ কি মা—তুমি এক সেরই আন্‌তে দিয়েছিলে তো! মাঝে থেকে—তোমার আদরের চাকর সেই গুয়ো পোড়ার্-মুখোই এই কারসাজি করেছে। অদৃষ্টটা এক বার দেখ মা, দেক; সেই এক সেরের যায়গায় তিন-পো সন্দেশ নিয়েই, গুয়োকে, যা মুখে এলো মা, গাল দিতে দিতে ঘরে গেলুম। ঘরে গিয়ে, জানালার উপর সেই সন্দেশ-কটা একটা পাথর চাপা

দিয়ে রেখেছিলুম। এক ঘুমের পর একটা শব্দ শুনে, আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে দেখি—এ সর্ব্বনাশ! আমার শ্রাদ্ধ একেবারে হয়ে গেছে! সন্দেশ তো নাই—সেই পাথরখানা শুদ্ধ ভেঙ্গে গেছে,—কোন আবাগী সর্ব্বনাশী বেড়াল এসে, আমার এই সর্ব্বনাশ করে গেছে। সে বেড়ালকে তা আর দেখতে পেলাম না। তখন আর কি করি মা; ঘুমন্ত মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে হড়্‌হড়্‌ করে টেনে তুল্লুম—আর যা মুখে এলো, তাই ব'লে গাল দিলুম; নাতিটাকেও শুদ্ধ মা, সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গাল দিয়ে ফেল্লুম। মেয়ের দোষে তো এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো। মেয়ে পোড়ারমুখী—

এই সময়, মুক্তকেশী সে কথায় বাধা দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন—মেয়ের দোষ কি?"

ক্ষীরোদা।—ও মা, মেয়েটা যে নিমন্ত্রণ খেয়ে এসেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটালে; পোড়া লোকে এমন হতশ্রদ্ধা নিমন্ত্রণ করে গা! তাদের নিমন্ত্রণের মুখে ঝাঁটা মারি। সেই নিমন্ত্রণ ছিল ব'লেই তো, রাত্রে আর মেয়েকে রাঁধ্‌তে হলো না; সন্ধ্যে থেকেই ষাঁড়ের মতন ঘুম জুড়ে দিলে। কাজেই, আর সন্দেশকটা এনে, মেয়ের হাতে দিতে পারলুম না। হাতে দিলে, নিশ্চয়ই সে সিকেয় তুলে রাখ্‌তো। আমার ঘুমে চোক জড়িয়ে এলো ব'লে, আমি জানালাতেই রাখলুম। তাতেই তো আমার এই সর্ব্বনাশ হলো! তা বল্‌ মা, —মেয়েরই দোষ কি না বল্‌।

হাসিয়া, মুক্তকেশী কহিল,—"তা, তুই আসল কথা ভুলে যাচ্ছিস্। কিসের দরুণ চারুর সঙ্গে তোর ঝগড়া হ'লো।"

ক্ষীরোদা।—তাই বলি মা—বলি। তবে কি জান—পাথরখানা ভেঙ্গে গেছে—এতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা। মা-কালীর পূজো—এর জন্যে দিতে হবে। তা হাতে একটিও পয়সা নাই; তাই ভাবছি—কি করে কালী-পূজো দেবো।

মুক্তকেশী।—সে জন্য তোর চিন্তা নাই; কালী-পূজোর খরচ আমিই তোকে দেবো। এখন আসল কথাটা বল্।

ক্ষীরোদা।—তা বলি মা—বলি। তুমি না দেবে তো আর কে দেবে মা? পরতে গেলে তোমার জন্যই আমার পাথরখানা ভেঙ্গেছে। এতে তোমারও, অকল্যাণ হ'তে পারে। তা সেই পাথরও গেল, আর সন্দেশও গেল। তোমার সন্দেশ খাওয়া, আমার না ত' অদৃষ্টে—

ক্ষীরোদার কথায় বাধা দিয়া, মুক্তকেশী এবার যেন একটু বিরক্তভাবে কহিল,—"সে সন্দেশ না হয় আবার দেবো। এখন, আসল কথাটা ছাই বল্ না।"

ক্ষীরোদা।—সমস্ত রাত্রি এই জন্য আর ঘুম হলো না। কাজেই উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। বিছানা থেকে উঠেই, সমস্ত কাপড়চোপড় নিয়ে, তোমার এই খিড়কীর পুকুরে এসে দেখি—একঘাট লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই পাড়া-কুঁদুলী কামিনীর মা আবাগী, নভয় ডাক্তারের মেয়ে-খাওয়ানর সুখ্যাতিতে আকাশ পাতাল একবারে কাঁপিয়ে তুলেছে। তাই দেখে, আমি কি আর চুপ ক'রে থাকতে পারি? সেই আবাগীকে আর সেই পোড়ারমুখো কালী মুখুয্যেকে খুব গা'ল দিলুম। তা কালী মুখুয্যের মেয়ে পোড়ারমুখী যে ঘাটে রয়েছে, তা আমি কি ক'রে জানিবো মা? পোড়ারমুখীর আস্পর্দ্ধা শুনেছ?—আমার

বলে কিনা—"তোর মুখের গাল বুকে পড়্বে !" আর কামিনীর-মা অবাগীও, এক জন নামজাদা পাড়াকুঁদুলী—সেও, নিশ্চয়ই আমার মনে মনে অনেক গাল্ দিয়েছে। তা দেখ মা দেখ, আমার সহ্যি-গুণটা একবার দেখ।

মুক্তকেশী তখন ক্ষীরোদাসুন্দরীর কাণে কাণে কি কথা বলিল। তাহাতেই আর কোন কথা হইল না। কেবল চক্ষে চক্ষে একটা ইঙ্গিত, আর ঘাড় নাড়ানাড়ি, আর চক্ষু ঠারাঠারি হইল। তখন ক্ষীরোদা, সেই জনমানবশূন্য ঘাটে বাসন মাজিতে বসিল; আর মুক্তকেশী, দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ প্রাতঃকালে, অভয়াচরণ ডাক্তার মহাশয়ের বাটীতে অনেকগুলি দীনদুঃখী রোগীর সমাগম হইয়াছে। প্রতিদিন ডাক্তার বাবু, অগ্রে এই সকল রোগী দেখিয়া, পরে অন্যান্য রোগী দেখিতে বাহির হইয়া থাকেন। গৃহে সমাগত রোগী সকলকে তিনি বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেন, এবং অবস্থা-বিশেষে বিনা মূল্যে ঔষধ এবং পথ্য পর্য্যন্তও দিয়া থাকেন। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর সম্মুখেই একটি পুষ্পোদ্যান। সে উদ্যানে নানা জাতীয় গোলাপ, বেল ও জুঁইফুল গাছের সংখ্যাই অধিক। গাছগুলি দেখিলেই, তাহারা যে বিশেষ যত্নে রক্ষিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার পর, সদরবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, ডান দিকে তাঁহার রোগী দেখিবার ঘর। ঘরের বাহিরের বারাণ্ডায়, তিন চারি খানি বেঞ্চে রোগীদিগের বসিবার স্থান। ঘরের মধ্যে একটি মারবেলের টেবেল। টেবেলের চারি ধারে চারিখানি চেয়ার। সম্মুখের চারিটা আলমারীতে অনেকগুলি ডাক্তারী-পুস্তক সাজান রহিয়াছে। গৃহের কতকাংশ পরদা আবৃত; গোপনে কোন রোগীকে দেখিতে হইলে, সেই আবৃতস্থানে যাইতে হয়। গৃহের অন্য আসবাবের মধ্যে একখানি কৌচ আছে; রোগীকে শয়ন করাইয়া পরীক্ষা করিতে হইলে, সেই কৌচে শয়ন করান হয়।

সদর দরজার বামদিকে ডিস্পেনসারী-গৃহ। সে গৃহে অনেকগুলি আলমারী, নানারূপ ঔষধাদিতে পরিপূর্ণ। গৃহের মাঝখানে একটি 'সো-কেস্'। তাহাতে নানারূপ ডাক্তারী অস্ত্র ও চিকিৎসোপযোগী অন্যান্য দ্রব্য সুন্দররূপে সুসজ্জিত। এই গৃহের পার্শ্বস্থিত অন্য একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার দরজার উপর 'প্রবেশ নিষেধ' কথা লেখা রহিয়াছে। তাহার পরেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে একটি সুন্দররূপে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, এই বৈঠকখানায় পাড়ার সকর্ম্মা ও নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিগণের একটি প্রধান আড্ডা। তাস, পাসা, দাবা—দিবারাত্রি চলিতেছে, আর তামাকেরও শ্রাদ্ধ হইতেছে। ডাক্তার বাবুর তামাকের খরচ প্রতিদিন পাঁচ সেরেরও অধিক। সে খরচের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নাই। গৃহেই প্রস্তুত হইয়া, দুইটা প্রকাণ্ড জালায় পূর্ণ থাকে; ফুরাইলেই আবার পরিপূর্ণ হয়। চৌধুরী পাড়ার অনেক বাড়ীতেই প্রায় তামাক ক্রয় করিতে হয় না।

আজ ডাক্তার বাবু যখন সমাগত রোগী দেখিতেছিলেন, তখনও তাঁহার এই বৈঠকখানা লোকশূন্য ছিল না। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, একে একে পাড়ার অনেকেই আসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ গল্প ও [illegible]র আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দুইজন ভৃত্য ক্রমাগত তামাক সাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে হাসির ধ্বনিতে সে গৃহ কম্পিত হইতেছে। ডাক্তার বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়াছে। সে ভ্রাতার নাম জানকীনাথ। আজ এই জানকীনাথকে লইয়া সকলেই আমোদ

করিতে উন্মত্ত। জানকী, ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি অপূর্ব্ব জীব। বোধ হয়, সৃষ্টিকর্ত্তা এই অপূর্ব্ব জীবকে সৃষ্টি করিবার সময় বড়ই ব্যস্ত ছিলেন, সেই কারণ তাঁহার এই সৃষ্টি-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকিবে। জানকীনাথের বয়ঃক্রম এখন প্রায় ষোড়শ বৎসর; কিন্তু তাহাকে দেখিলে সে বয়স ঠিক অনু-মান করা যায় না। জানকীনাথের মস্তক আয়তনে সুদীর্ঘ হইলেও তাহার ভিতর মস্তিষ্ক নামক কোন পদার্থ আছে বলিয়া, বোধ হয় না। জানকীনাথ, পঞ্চম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া এই ষোড়শ বৎসরেও বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ খানি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। স্মরণশক্তি এতদূর প্রখর যে, পিতার নামও অনেক কষ্টে অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে বলিতে পারে। জানকীনাথের কেবল মস্তকটি বড় নয়, মস্তকানুযায়ী তাহার মুখগহ্বর ও দন্তপংক্তিও অসাধারণ। মুখগহ্বর, বোধ হয়, কেবল এককালীন অধিক আহারীয় দ্রব্য প্রবেশের পথ সুগম করিবার জন্যই আকর্ণবিস্তৃত। ওষ্ঠদ্বয় বর্দ্ধিত আয়তনযুক্ত হইলেও কিন্তু দন্তপংক্তি আবৃত করিতে সক্ষম হয় নাই। কারণ সে ওষ্ঠদ্বয়ের গতি, সরল না হয়া, বক্রভাবে উলটাইয়া পড়িয়াছিল। হস্তপদদ্বয়, দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। হাসি ও কান্না জানকীনাথের একবারে সম্পূর্ণ বশীভূত ছিল। সে হাসিতেছে—কি কাঁদিতেছে, অনেক সময় আবার, স্থির করাও দুরূহ। কথা কহিবার সময়, ঘাড়মুখ বাঁকাইয়া, সে এরূপ একটা অঙ্গভঙ্গি করিত যে, তাহা দেখিলে, অনেকেই হাস্যসংবরণ করিতে পারিত না। এখন, বৈঠক-খানায়, হরকালী মাষ্টার, রামধন চক্রবর্ত্তী ও গিরীশচন্দ্র

বসু প্রভৃতি প্রতিবাসিগণ উপবিষ্ট ছিলেন। জানকীনাথকে দেখিয়া, গিরীশ বাবু বলিলেন,—"মাষ্টার মশাই, আমাদের জানকীকে আপনার স্কুলে ভর্ত্তি করে নিন।"

মাষ্টার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"এমন ছাত্ররত্ন লাভ করা কি আমাদের অদৃষ্টে ঘট্‌বে ?"

রামধন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সময় কহিলেন—"বাবা জানকী, তোমার আর বাড়ী গিয়ে কাজ নাই। এইখানে থাক ; আর এই মাষ্টার মহাশয়ের স্কুলে ভর্ত্তি হও।"

জানকীনাথ, অঙ্গভঙ্গির সহিত হাসিতে হাসিতে বলিল,—আমি এখন এইখানে থাক্‌বো। দিদি আমায় রাখ্‌বে বলেছে। কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তি হ'ব না। আমি আফিসে একটা চাক্‌রী-বাক্‌রী কর্‌বো।"

হরকালী।—দেখ্‌লে বোস্‌জা, অদৃষ্টটা একবার দেখ্‌লে ? এরূপ রত্ন, আমাদের স্কুলে আস্‌বে কেন ?

গিরীশ।—হাঁরে জানকী, স্কুলে না গিয়ে আফিসে যাবি কেন ?

জানকী।—স্কুলে যে মারে ?

গিরীশ।—আর আফিসে কি মারে না ?

জানকী, তখন আপনার দেহের ডান দিকে মরালগ্রীবা করিয়া, সহাস্যবদনে সুবৃহৎ দন্তপংক্তি বাহির করিয়া বলিল, আমি কি জানি না নাকি ? আফিসে মার্‌বে কেন ? আফিসে যে টাকা দেয়। আমি টাকা বড় ভাল বাসি।"

গিরীশ।—তুই টাকা নিয়ে কি কর্‌বি ?

জানকী।—কেন—জানি না নাকি ? খাবার কিনে খাবো।

এই সময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"দেখ্‌লে বাবা, কে বলে বাবাজীর আমার বুদ্ধি নাই! তা বাবা, কেবল খাবার কিনেই খাবে? আর কাউকে সে টাকা দেবে না?"

জানকী। কেন—জানি না নাকি? বল্‌বো—হিঃ হিঃ হিঃ—বড় লজ্জা করে।

চক্রবর্ত্তী।—লজ্জা কিরে বাবা? লক্ষ্মী ধন আমার, বল—বল—বল।

দেহের উর্দ্ধাঙ্গ দোলাইতে দোলাইতে, জানকীনাথ মুখ-ভঙ্গিমার সহিত বলিল,—"জানি না নাকি?" তাহার পর একটু গম্ভীরভাবে বলিল,—"এ কথাটার ঠিক্ উত্তর দিলে, আমায় কিন্তু এখনি চার্‌টে পয়সা দিতে হবে।"

গিরীশ বাবু, পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, —"আচ্ছা, এই পয়সা রইলো। এখন কথাটার ঠিক উত্তর দাও দেখি, চাঁদ।"

জানকী।—জানি না নাকি? কেন—বে হলে, টাকা বউকে দেবো।

জানকীনাথের এই উত্তর শুনিয়া, গৃহস্থ সকলের মধ্যে একটা উচ্চহাস্যের ধ্বনি উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে, জানকীনাথের এইরূপ প্রখর বুদ্ধি সম্বন্ধে, চারিদিক হইতে একটা 'বাহবা' পড়িয়া গেল। বিজয়ী জানকীনাথ, তখন মহা-আহ্লাদে হস্ত প্রসারণ করিয়া অঙ্গীকৃত পুরস্কার চাহিল। গিরীশ বাবু, এইবার আর একটু রঙ্গ করিবার জন্ত বলিলেন,—"আর একটী কথার উত্তর দিলে, তবে এ পয়সা পাবে।"

জানকীনাথ, এবার মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর করিয়া কহিল,—

"জানি না নাকি? আমায় ঠকাবার মৎলব? আমি সে ছেলে নই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, কিন্তু বাবা, এমন্ সব-জান্তা ছেলে কখন দেখি নাই।"

এই সময়, প্রতারিত হইবার ভয়ে, জানকীনাথের সেই গম্ভীর মুখ ক্রমে গম্ভীরতর হইতে লাগিল। নিদাঘের পরিষ্কার গগন অপরাহ্নে হঠাৎ মেঘাবৃত হইলে যেরূপ হয়, জানকীনাথের মুখমণ্ডলও, দেখিতে দেখিতে সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তাহার পরমুহূর্ত্তেই বর্ষণ আরম্ভ হইল। কেবল বর্ষণ নয় সঙ্গে সঙ্গে আবার ভীষণ গর্জ্জনও চলিতে লাগিল। তখন জানকীনাথের ক্রন্দনে, বৈঠকখানা কম্পিত হইয়া উঠিল!

এই সময় ডাক্তারবাবু সমাগত রোগিগণকে দেখিয়া, পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে যাইতেছিলেন। জানকীনাথের চীৎকার শুনিয়া, কহিলেন,—"খোকা কাঁদে কেন হে?"

ডাক্তার বাবুর গলার শব্দ শুনিয়া, গিরীশ বাবু, তাড়াতাড়ি সেই পয়সা চারিটা জানকীনাথের হস্তে দিলেন। সে পয়সার কি মোহিনী শক্তি—আমরা জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল! পয়সা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, জানকীনাথের ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে উচ্চ হাস্যধ্বনি! একে অশ্রুধারা তখনও বহিতেছে—আর এদিকে মুখে হাসির ফোয়ারাও ছুটিতেছে। শরৎকালে একত্রে রৌদ্রবৃষ্টির ন্যায় কি অপূর্ব্ব শোভা! উপস্থিত সকলেই, এই ঘটনায় হাসিয়া লুটাপুটি খাইতে লাগিলেন। আর এই সুযোগে বুদ্ধিমান জানকীনাথ, সেই গৃহ হইতে এক লম্বা দৌড় দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জানকীনাথ দৌড়িয়া একবারে অন্দরমহলে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই কনিষ্ঠা ভগিনী কমলার নিকট পয়সা কয়েকটা বাজাইয়া কহিল—"কম্‌লি, আমার কত পয়সা দেখেছিস্?"

কমলা আগ্রহের সহিত কহিল—"আমায় একটা পয়সা দাও না দাদা।"

জানকী নাথ মুখ ভঙ্গিমার সহিত কহিল,—"বাঃ রে! আমার পয়সা তোকে দেবো কেন? তোর কত পয়সা আছে—জানি না কি?"

কমলা:—আমি পয়সা কোথায় পাবো?

জানকী।—কেন তোকে দিদি পয়সা দেয়—চৌধুরী মশাই পয়সা দেয়—আমি জানি না কি

কমলা।—সে যখন দেবে, আমি তখন তোমায় সে পয়সার ভাগ দেবো।

জানকী।—তুই কেন ভাগ দিবি—জানি না কি? আমি যে তোর বড় ভাই—ভাগ তোকে দিতেই হবে, না দিলে খুব মারবো।

কমলা।—আমি ছোট বোন, আমার একটা পয়সাও বুঝি দিতে নেই—আমায় পয়সা দিলে আমি কত ভালবাসবো।

জানকী। তুই দিদির কাছ থেকে পয়সা নিগে যা, কিন্তু পয়সা পেলে, আমায় সে পয়সার ভাগ দিতে হবে।

কমলা তখন রাগিয়া কহিল,—"আমার দিতে বয়ে গেছে।"

সে কথা শুনিয়া জানকী তাহাকে মারিতে গেল, সে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পলাইল। এমন সময় অন্দর মহলে একটা বিষম হাসির ধ্বনি উঠিল। গৌরের মা ঝি, ওয়াক্ ওয়াক শব্দে বমি করিতেছে, আর অন্দরস্থিত মহিলাসকল তাহার চারিদিকে হাসিয়া লুটোপুটী খাইতেছে। প্রায় দশ মিনিট কাল এইরূপ চলিল, তাহার পর, গৌরেরমার বমনও ক্রমে থামিল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীমহলের সে উচ্চ হাসিও থামিয়া গেল। তখন সৌদামিনী কহিল—"হাঁ গৌরের মা,—তুই পেচ্ছাব খেলি কি করে?"

গৌরের মা বমনের ধমকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—ওমা পেট গরম হয়েছিল বলে, এক পয়সার বাতাসা ঐ ঘরের মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিলুম—এখন খেয়ে দেখি—সে বাতাসার জল নয়—একবারে ডাহা মুত্ মা, তাহা মুত্।"

বলিয়াই গৌরের মা পুনরায় ওয়াক্ ওয়াক্ আরম্ভ করিল, স্ত্রীলোকগণের হাসির ফোয়ারাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সৌদামিনী সকলকে হাসিতে নিষেধ করিল। অনেক কষ্টে সকলের হাসি থামিল, কিন্তু অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার সেই সর্ব্বগুণাধার ভ্রাতা জানকীনাথ তখনও হাসিতে ছিল, তাহার হাসি আর থামে না। তাহাকে এইরূপ হাসিতে দেখিয়াই সৌদামিনী কহিল—"এ কাজ আর কারো নয়, এ জানকেরই কাজ।"

অন্নপ্রাসন উপলক্ষে অনেকগুলি কুটুম্বিনীর সমাগম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জানকীনাথের পিসিমাতাও ছিলেন।

জানকীনাথ শৈশবেই মাতৃহীন, এই পিসীই তাহাকে প্রতিপালন করিয়া ছিলেন, সুতরাং জানকী নাথের কোনরূপ নিন্দা তিনি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিতেন না। অন্য কেহ এ কথা কহিলে নিশ্চয়ই এতক্ষণ একটা কোন্দল বাধিয়া যাইত, কিন্তু তাঁহারই আদরের ভাই-ঝি এই জানকীনাথেরই সহোদরা ভগিনী সৌদামিনী—যখন এই কথা বলিতেছে, তখন কথাটাকে চাপা দেওয়াই উচিত বিবেচনা করিয়া পিসি-মা কহিলেন—"হাঁ গৌরের মা, তোর যে বমি থামে না দেখ্‌ছি। কতখানি ঘৃত খেয়ে ফেলেছিস্?"

গৌরের মা। বাসন কয়খানা মেজে, বড় তেষ্টাও পেয়েছিল মা, তাই একবারে প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলেছি।"

বলিয়াই গৌরের মা পুনরায় বমন আরম্ভ করিল, আর সৌদামিনীর নিষেধ সত্যেও রমণীকুল পুনরায় হাসিয়া লুটোপুটী খাইতে লাগিল। সৌদামিনী তখন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, জানকী নাথকে কহিল,—"তুই এমন কাজ কেন করলি বল।"

জানকীনাথ অম্লান বদনে মিথ্যা কথা কহিল। আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য অনেক দিব্য পর্য্যন্ত গালিল,। জানকীনাথের পিসী-মাও সে সম্বন্ধে জানকীনাথের অনেক সাহায্য করিলেন। কিন্তু সৌদামিনীর অটল বিশ্বাস কিছুতেই টলিল না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর কহিল,—"আমায় এ কাজ করতে কে দেখেছে—আগে বলুক—তখন আমি স্বীকার পাবো। আমি জানি না নাকি?—দিদিকে কে মিথ্যে করে লাগিয়েছে।"

সৌদামিনী তখন রাগিয়া কহিল, "কেউ মিথ্যে করে লাগায় নাই, কমলী এ কাজ করতে তোকে স্বচক্ষে দেখেছে।"

প্রহারের ভয়ে কমলা কোথায় পলাইয়া গিয়াছিল, সে তথায় উপস্থিত ছিল না, সেই কারণ সৌদামিনী জানকীনাথকে ভয় দিয়া, তাহারই নাম করিল। অমনি জানকীনাথ বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"কি! আমায় দেখেছে? মিথ্যে কথা—আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে, ঘটিতে মুতেছি—কম্‌লী কি করে দেখ্‌তে পারে?"

"তবে রে পোড়ার-মুখো, ঘরের দরজা বন্ধ করে, ঘটিতে মাতা বার করছি—দাড়াও।"—এই কথা বলিয়া সৌদামিনী জানকীনাথকে প্রহার করিতে দৌড়িল, কিন্তু দৌড়ে জানকীনাথ একবারে বিশ্ববিজয়ী; সুতরাং সৌদামিনী তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এবারে জানকীনাথ এক দৌড়ে ছাদের উপর আসিল। সেখানে আসিয়া দেখিল যে এক খানি নূতন ভাল কাপড় আলিসার উপর শুকাইতেছে। সে কাপড় দেখিয়া জানকীনাথের হাতটা কেমন সুড়সুড় করিয়া উঠিল। এ অবস্থায় কি করিবে—কিছুক্ষণ ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে যেখানে সেই কাপড়খানি শুকাইতেছিল, সেই আলিসার নিকট গেল, আবার কি ভাবিয়া, সেখান হইতে সরিয়া আসিল। একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল—কোথাও কেহ নাই। দেখিতে বা ধরিতে পারিবার যখন কোন সম্ভাবনাই নাই—তখন জানকীনাথ কি আর সে লোভসংবরণ করিতে পারে? কাহার সে কাপড় জানকীনাথ তাহা জানে না, জানকীনাথের সহিত

বাড়ীতে কাহার শক্রতাও নাই; তত্রাচ কাপড়খানি নূতন, আর যখন সে নূতন কাপড় ছিঁড়িলে,কেহ দেখিতেও পাইবে না, তখন জানকীনাথ কিরূপে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া যায় বল? সে নূতন কাপড় টানিয়া ছিঁড়িতে, জানকী নাথের বিশেষ কষ্ট হইলেও, জানকীনাথ অম্লানবদনে সে কষ্ট সহ্য করিল। দুই হাতে ধরিয়া প্রায় দুইহাত কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিঁড়িয়াই, সে স্থান হইতে এক দৌড়ে, একবারে অন্দরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সদর বাড়ীতে তখনও অনেক লোক ছিল, সুতরাং সে স্থানে তখন থাকিতে জানকীনাথের কি জানি কেন—ইচ্ছা হইল না। এখন জানকীনাথের একটা নির্জ্জন স্থান চাই। পুনরায় এক দৌড়ে জানকীনাথ খিড়কীর দিকে গেল। খিড়কীর দরজায় পার্শ্বেই একটি লাউ গাছ সতেজে নিকটস্থ মাচায় উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। সেই সতেজ গাছটি অচিরেই জানকীনাথের মন আকর্ষণ করিয়া ফেলিল। অন্য দিকে যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও জানকী নাথের পা আর সে দিকে কিছুতেই চলিল না। জানকীনাথ একবার সতৃষ্ণনয়নে দরজার দিকে চাহিল; তাহার পর মুহূর্ত্তেই সজোরে সেই সতেজ লাউগাছ উপাড়িয়া ফেলিল, এবং সে স্থান হইতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সেখান হইতে খিড়কীর পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া দেখিল—একটা দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ কুকুর চাতালের উপর সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাকে এরূপ নির্জীব ও নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া, একটা বীরত্ব প্রকাশ করিবার জানকীনাথের বড়ই ইচ্ছা হইল। অদূরে একটা ঢিলও পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল। তখন

জানকীনাথের হস্ত হইতে সেই ঢিল লইয়া কুকুরকে আঘাত করিল, অমনি সেই কুকুর দৌড়িয়া আসিয়া তাহার সেই হাত কামড়াইয়া ধরিল। কুকুরের নখাঘাতেও তাহার দেহের অনেক-স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ক্ষত স্থান হইতে রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল, আর এদিকে জানকীনাথের চীৎকারেও চারিদিক কম্পিত হইতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জানকীর চীৎকারে খিড়্‌কী পুষ্করিণীর ঘাটে সকলে দৌড়িয়া আসিল। জানকীর পিসী-মাতা ত একবারে কাঁদিয়া আকুল। এদিকে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, আর অন্য দিকে কুকুরের উপর অজস্র গালিবর্ষণ হইতেছে, কুকুরের প্রভুও অব্যাহতি পাইতেছিল না। পিসী-মাতার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাতে জানকীনাথের ক্রন্দনের মাত্রা হ্রাস না হইয়া বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহা দেখিয়া সৌদামিনী কহিল,—"কুকুর তোকে কাম্‌ড়াইল কেন? তুই কি কুকুরকে কিছু বলেছিলি?"

জানকী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি কিছুই বলি নাই দিদি, কেবল একটা ঢিল মেরেছিলুম।"

সৌদামিনী। তবে কুকুরের দোষ কি? নিজের বুদ্ধির দোষে এখন যেমন কাজ করেছ, তার ফলভোগ কর।

সৌদামিনীর এই কথায় পিসী-মাতার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তখন চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিলেন—"ছেলেরা কুকুরকে অমন ঢিল মেরে থাকে, তা বলে কুকুরের এত বড় আস্পর্দ্ধা হবে যে আমার বাছাকে কাম্‌ড়াবে?"

সৌদামিনী। পিসী-মা, তোমার যে আদরের বাছা, তা

কুকুর কি করে জান্‌বে? তাকে ঢিল মেরেছে, কাজেই সে কাম্‌ড়েছে। তোমার নিজের বাছাকে সাবধান করে রাখ্‌তে পার নাই?

এমন সময় গৌরের-মা সেই ছাদের উপর হইতে নূতন ছিন্ন বস্ত্রখানি আনিয়া সেইখানে উপস্থিত করিল। সে বস্ত্রখানি সৌদামিনীর। সৌদামিনী তাহা দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমার এ নূতন কাপড় কে ছিঁড়লে?"

তখন জানকীনাথ অমনি বলিয়া উঠিল—"দিদি, আমি ছাদের উপর যাই নাই, আর তোমার কাপড়ও ছিঁড়ি নাই।"

কিন্তু জানকীনাথকে ছাদের উপর যাইতে যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা সাক্ষ্য দিল। তখন জানকীনাথেরই যে এই কাজ—এ বিষয়ে সৌদামিনীর মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। এইবার সৌদামিনীর বড় রাগ হইল, কিন্তু পিসীমাতার ভয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কোনরূপ শাসন করিতে পারিল না।

সৌদামিনী আর সে স্থানে দাঁড়াইতে পারিল না, বাড়ীর দিকে দ্রুতগতিতে চলিল। জানকীনাথ ও অন্যান্য সকলেও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। খিড়্‌কীর দরজার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, জানকী তাহার ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল—"দিদি, গৌরের-মা তোমার লাউগাছ ছিঁড়েছে দেখ।"

সৌদামিনীর তখন লাউ গাছের প্রতি কোন লক্ষ্যই ছিল না। সেই ছিন্নমূল গাছ তখনও সতেজ ছিল, তাহার তখনও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং সে দিকে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। এখন জানকীনাথের কথায় সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়াই অবাক্! গৌরের-মা মাগী

ও এবারে কাঁদিয়া ফেলিল। সে যে এরূপ কার্য্য করে নাই, তাহার জন্ত শপথ করিল, ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করিয়াও শপথ করিতে প্রস্তুত হইল। কে এ কার্য্য করিয়াছে—তাহা জানিতে সৌদামিনীর কিন্তু বাকি রহিল না। সৌদামিনী গৌরের-মাকে সান্ত্বনা করিল, জানকী-নাথকে আর কোন কথা বলিল না। ঘৃণায় ও লজ্জায় তখন তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সৌদামিনী আর কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, আপনার শয়নগৃহে আসিয়া কাঁদিতে বসিল।

এমন সময় অভয়াচরণ সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিয়া পত্নীকে কাঁদিতে দেখিলেন, এবং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাঁদ কেন?"

সৌদামিনী স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না, আর উত্তরইবা দিবে কি? সে প্রশ্নে বরং তাহার ক্রন্দনের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। অভয় বাবু স্ত্রীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল; আর বিশেষতঃ এ ক্রন্দনের কারণ তিনি কিছুই অবগত নহেন। সেই কারণ, পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কেন কাঁদ আমায় বল না?"

সৌদামিনী। আমি বড়ই জ্বালাতন হয়েছি, পিসী-মা আর জান্‌কের জ্বালায় আমার হাড়মাস দগ্ধ হচ্ছে।"

অভয় বাবু পত্নীর এ কথায় মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ তিনিও ইহাদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"সৌদামিনী, তোমায় একটী কথা বলি, তুমি রাগ করিও না। আমি এত দিন তোমায় কোন কথা বলি নাই, কিন্তু আজ যখন তোমার চৈতন্ত হয়েছে, তখন

এ সুযোগ আমি ছাড়্‌ব না। তোমার অনেক গুণ, কিন্তু এক দোষে সে সকল গুণই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার পিতৃকুল হতে নিজেও নষ্ট হবে, আর আমাকেও নষ্ট করবে। আমি যা কিছু উপার্জ্জন করি, সবই তোমার হাতে দিই, কিন্তু তুমি এত খরচ কর যে, প্রতি মাসেই আমার দেনা হয়, এই রকমে আমি ক্রমে দেনায় ডুবে যাচ্ছি। আমি বেশ বিবেচনা করে দেখেছি যে, তোমার পিতৃকুলের জন্যই আমার এত খরচ হয়, তোমার বাপের বাড়ীর সংসার খরচ দিতে আমি অসম্মত নই, কিন্তু সে খরচের একটা বাঁধাবাঁধি থাকা আবশ্যক।”

স্বামীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া সৌদামিনীর প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অভিমানে তাহার প্রাণ ফাটিবার উপক্রম হইল। সৌদামিনী স্বামীর কথার উত্তর না দিয়া, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কান্না দেখিয়া, অভয় বাবুর প্রাণ ফাটিয়া গেল। তখন, তাঁহার মৃদু ভর্ৎসনাই সৌদামিনীর ক্রন্দনের কারণ মনে করিয়া, তিনি মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিলেন, এবং বিনীতভাবে সৌদামিনীকে কহিলেন—“সৌদামিনী, আমি তোমায় এ সকল কথা বলে ভাল করি নাই। তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কখনও তোমার বিপক্ষে কোন কথা বল্‌ব না। আর তোমারই ভালর জন্য আজ এ কথা বলেছি। তুমি কিছু সঞ্চয় করে রাখ্‌তে পারলে, তোমার পক্ষেই ভাল। আর যখন তোমার গর্ব্বে এক রত্তি জন্মেছে, তার মুখ চেয়েও তোমার একটু হিসেব করে চলা উচিত।”

সৌদামিনী এইবার চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—“আমি কি বে-হিসিবি চলি?”

সে অভিমান মিশ্রিত সকরুণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া অভয় বাবু আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। তখন পত্নীর কোন দোষের কথা তাঁহার আর মনে রহিল না, তিনি পত্নীকে উপদেশ দিতে গিয়া যে নিজেই ঘোরতর অপরাধী হইয়াছেন, এই কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। সুতরাং অপরাধীর ন্যায় অতি বিনীতভাবে কহিলেন,—"সৌদামিনী, সমস্ত দিন খেটে খেটে আমার মাথার ঠিক থাকে না, সেই জন্য তোমায় যদি কোন রূঢ় কথা বলে থাকি, তুমি নিজ গুণে আমায় ক্ষমা কর।"

এই বলিয়া অভয় বাবু পত্নীর দুইটি হাত ধরিলেন। তখন কি অভিমানিনীর সে অভিমান আর থাকিতে পারে? সৌদামিনী সেই হাত দুইটি আপনার গলদেশে স্থাপিত করিয়া কহিল—"কই—তুমিত আমায় কোন রূঢ় কথা বল নাই।"

অভয় বাবু তখন পত্নীকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

—০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে নির্ম্মলকুমারী অবনতমস্তকে বসিয়া রহিয়াছে। নির্ম্মল এখন কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্না, তাহার সে চিন্তাসাগর অপার—গভীরতাতেও অতলস্পর্শ। নির্ম্মল এ সংসারের ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম কিছুই চায় না, অথচ নির্ম্মলকুমারীর ন্যায়, দুঃখিনী এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই! তাহার কারণ, নির্ম্মলকুমারী যাহা চায়, তাহা সে পায় না, বুঝি এ জীবনে তাহা পাইবার আশা পর্য্যন্ত নাই—সেই জন্যই নির্ম্মল দুঃখিনী। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম এ সকল কিছুরই নির্ম্মলের অভাব ছিল না; বরং প্রচুর পরিমাণেই ছিল, কিন্তু তথাপি নির্ম্মল আপনাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা হেয় ও অতি নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করিত। এ সংসারে নির্ম্মলকে আদর, যত্ন ও ভালবাসিতে অনেকেই ছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য যাহার আদর, যত্ন বা ভালবাসা পাইলে, নির্ম্মল নিজের অবশিষ্ট জীবন, সেই মুহূর্ত্তের সঙ্গে বিনিময় করিতে প্রস্তুত, নির্ম্মলকুমারী তাঁহার আদর, যত্ন বা ভালবাসা এ জীবনে কখন পায় নাই! বুঝি পাইবার আশা পর্য্যন্তও নাই! সুতরাং নির্ম্মলকুমারীর ন্যায় হতভাগা আর এ পৃথিবীতে কে আছে?

পিত্রালয়ে নির্ম্মলের আদর, যত্ন, স্নেহ, ভালবাসা ও সোহাগের অভাব ছিল না। দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আত্মীয়স্বজনই নির্ম্মলকে আদর ও যত্ন করিত। বিশেষতঃ সে হতভাগা বলিয়া, তাহাদের সেই আদর ও যত্নের মাত্রা অধিক পরিমাণে নির্ম্মলের উপর ন্যস্ত হইত। সে আদর ও যত্ন নির্ম্মল কিন্তু ভালবাসিত না, বরং তাহাকে বিষতুল্য মনে করিত। নির্ম্মলের জনক জননী আজও বর্ত্তমান, তাঁহাদের অগাধ স্নেহরাশি তাঁহারা নির্ম্মলের উপর অকাতরে ঢালিয়া দিতেন, তথাপি নির্ম্মলের কিছুতেই স্ফূর্ত্তি ছিল না, নির্ম্মল দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতেছিল। আর নির্ম্মলকে ভালবাসিত বা সোহাগ করিত না কে? এক মুক্তকেশী ব্যতীত যে দেখিত, সেই নির্ম্মলের প্রকৃতি ও চরিত্রগুণে, তাহাকে ভাল বাসিত ও সোহাগ করিত। কিন্তু নির্ম্মল এ সকল কিছুই চায় না, অনেক সময় বরং তাহার এই সকলে বিরক্তবোধ হইত, কারণ নির্ম্মলের মনে হইত—তাহার মত পাপী বোধ হয়, এ পৃথিবীতে নাই! তাহা না হইলে ভগবান তাহাকে এরূপ কঠোর শাস্তি দিবেন কেন? এই কারণেই নির্ম্মল আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় ও নিকৃষ্ট জীব মনে করিয়া সর্ব্বদাই অতি সন্তর্পণে থাকিত।

যখন নির্ম্মল পিত্রালয়ে আদর, যত্ন ও ভালবাসা প্রভৃতিতে বিরক্ত হইয়া উঠিত, তখন শ্বশুরালয়ে আসিত। এখানে কিন্তু তাহার ঠিক বিপরীত হইত; মুক্তকেশী নির্ম্মলকুমারীকে দেখিলে, জ্বলিয়া উঠিত। তাহার যত আক্রোশ ও যত হিংসা—সে কেবল এই হতভাগা নির্ম্মলকুমারীর উপর। তাহার কারণ,

মুক্তকেশীর স্বর্গীয় পিতা এই নির্ম্মলকুমারীর নিরুদ্দেশ স্বামীকেই তাঁহার সমস্ত বিষয় উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে, নির্ম্মলই তাঁহার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে—এ ব্যবস্থাও উইলে করিয়া গিয়াছেন। মুক্তকেশী পিতার একমাত্র কন্যা হইয়াও কোন বিষয়ের অধিকারিণী হইল না, আর ইহারা কোথা হইতে আসিয়া, তাহার পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইতেছে,—নির্ম্মলকুমারীর উপর মুক্তকেশীর ক্রোধ ও হিংসার কারণ ইহাই। মুক্তকেশী এই জন্য যত পারিত, নির্ম্মলকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দিত, অনেক সময় নির্ম্মলের তাহাই ভাল লাগিত। তবে যখন বড়ই বাড়াবাড়ি হইত, তখন নির্ম্মল পুনরায় পিত্রালয়ে চলিয়া যাইত।

আজ নির্ম্মল পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে, কিন্তু আসিবামাত্র মুক্তকেশী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া এই নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে। এ ভাবনার ভিতর কিন্তু মুক্তকেশীর উপর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। এমন সময় ক্ষীরোদাসুন্দরী সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই নির্ম্মলকে দেখিয়া কহিল—"ও মা! এই যে এ ঘর, একলাটি বসে—কি ভাবা হচ্ছে! আর আমি সমস্ত বাড়ীখানা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা বলছিলাম কি—হ্যাঁগা ভালমানুষের মেয়ে, এই মুক্তকেশী—তা'র ত জ্বালাতনের শরীর, তোমার স্বামী বরং এক দিন ঘরে আস্‌তে পারে, তার'ত আর আসবে না, আর ওরই বাপ, আমার প্রসন্ন দাদা—মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিয়ে, তোমাদেরই ভাল করে গেছেন—তা ওর এই সকল জ্বালার উপর, আবার জ্বালা কেন বাড়াও বাছা?

আহা! এই আলাতনের শরীরের উপর—এ সকল কথা ওর শরীরে সইবে কেন?”

ক্ষীরোদার এই সকল কথা শুনিয়া নির্ম্মল বিস্মিত হইয়া কহিল —“কেন—আমি ঠাকুর-ঝিকে কি বলেছি মাসী-মা?”

এই সময় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে মুক্তকেশী সেই গৃহে দৌড়িয়া আসিয়া মুখভঙ্গিমার সহিত কহিল—“কেন? তুমি বল্‌তে বাকি রেখেছ কি? কেবল মার্‌তেই বাকি রেখেছ, তা মার্‌বে নাকি?”

নির্ম্মল ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠে—আকুল প্রাণে কহিল—“কেন ঠাকুর-ঝি, তুমি অমন কথা মুখে আন?”

মুক্তকেশী মুখভঙ্গিমার সহিত হাত মুখ নাড়িয়া—বিদ্রূপছলে কহিল—“কে-ন ঠা-কু-র-ঝি, তু-মি অ-ম-ন ক-থা মু-খে আ-ন” —আহা! নেকী আর কি! দেখ্ ক্ষিরো-পিসী দেখ্ সবাই যে খুব ভাল মানুষ বলে—তা আমার মুখের উপর চোপা কর্‌বার ঘট টা একবার দেখ!”

ক্ষিরোদা তখন ভালমানুষটির মতন বলিল—“তাই ত মা! আমি ত দেখে শুনে একবারে অবাক্ হয়ে গেছি! আমার মুখে আর কথা বেরুচ্ছে না। তা ধর্ম্ম কথা কইবো—এতে আর ভয় কি? দেখ বউ-মা, তুমি বাছা ভাল মানুষের মেয়ে নও।”

মুক্ত। ভাল মানুষের মেয়ে না অতি ছোট লোকের মেয়ে!

নির্ম্মল। ঠাকুর-ঝি, তুমি আমায় যত পার গাল্ দাও, আমি একটীও কথা বল্‌বো না, কিন্তু আমার বাপ্‌কে কোন ল্ দিও না।

ক্ষিরো। কেন দেবে না বাছা? ওর বাপের সঙ্গে কি কখন তোমার বাপের তুলনা হয়? এই যে আমাদের এতখানি খরচ হলো, কখন তোমার বাপের বাড়ী পাতও পাড়ি নাই; গেল বৎসর পূজোর সময় গিয়েছিলুম, তা সে কেবল ভাতের কাণ্ড দেখ্‌লুম। আমরা বিধবা মানুষ, তোমার বাপের যজ্ঞির ভাত ত আর খেতে পারি না? তা হ'ক না— ভাতের উপর এত বঁদে, জিলিপি ও মুণ্ডির যে ছড়াছড়ি হলো, তা আসবার সময় আমার আঁচলে কি কিছু দিতে পেরেছিল? দেওয়া-থোয়া যেমন এ বাড়ীতে দেখি, এমন বাছা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও দেখি না।

মুক্ত। আমি তোর নাতির জন্যে গোটা কতক ভাল সন্দেশ রেখেছি, তা যাবার সময় নিয়ে যাস্।

ক্ষিরো। তা যাবো মা, যাবো। তা এখন এই ভাল মানুষের মেয়েটীকে বল্‌ছি—তোমার বাপ আমায় কিছু দিগ্ আর নাই দিগ্, তোমায় ত বাছা খুব যত্ন করে; তবে তুমি এক কুঁদুল করবার মতলব ভিন্ন, আর কি জন্য এ বাড়ীতে আস?

নির্ম্মল। যদি আমার আসাতে ঠাকুরঝির প্রাণে কষ্ট হয়, তবে আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—এ জীবনে এ বাড়ীতে আর কখন আস্‌বো না। ঠাকুরঝি,—

বলিতে বলিতে নির্ম্মলের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! বেগবতী স্রোতস্বতীর হঠাৎ বাঁধ ভাঙ্গিলে, যেরূপ একটা উচ্ছ্বাস হয়, নির্ম্মলের প্রাণের ভিতর কোথা হইতে সেইরূপ একটা উচ্ছ্বাস আসিয়া উপস্থিত হইল! অজস্র অশ্রুবিন্দুতে নির্ম্মলের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, নির্ম্মল পুনরায় প্রকৃতস্থ

হইল। প্রকৃতিস্থ হইয়া, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—"ঠাকুর-ঝি, আমি এই সকল ঐশ্বর্য্য ভোগ করবো বলে, এ বাড়ীতে আসি না। আমি তোমায় আমার বড় ভগিনী মনে করি, দাসীর মতন তোমার সেবা করবো বলে আসি। এ ভাবে আসাতেও যদি তুমি বিরক্ত হও, তবে আর আসবো না। এই আমি তোমায় শেষ প্রণাম করে চল্লুম।"

এই কথা বলিতে বলিতে মুক্তকেশীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া নির্ম্মলকুমারী ধীরে ধীরে সে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। আমরা সকল কথা সত্যই বলিব—সে সময় নির্ম্মলের জন্য মুক্তকেশীর প্রাণও ব্যথিত হইয়াছিল, মুক্তকেশী তখন দৌড়িয়া নির্ম্মলকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছিল, কিন্তু ক্ষিরোদাসুন্দরী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—"যাক্, শত্রু জন্মের মত বিদেয় হয়ে যাক্।"

মুক্তকেশী আর ফিরাইতে গেল না, কিন্তু এই সময় সে প্রাণের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। ক্ষিরোদা তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কহিল—"হাঁ—বল্ছিলুম কি, সন্দেশ কটি ত নিয়ে যাব। আস্বার সময়, তোমার বাগান-থেকে মা, এক কাঁদি কাঁচ-কলা তোমার শুয়ো চাকর কেটে নিয়ে যাচ্ছে দেখ্লুম। তা অত কাঁচকলা আর তোমাদের কি হবে? তবে তোমাদের বাগানের কাঁচকলার মতন মিষ্টি কাঁচকলা আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কখন দেখি নাই। সেত কাঁচ-কলা নয়, যেন অমৃত। আমি—"

মুক্তকেশী আত্ম-প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভাল বাসিত, এমন কি আত্ম-প্রশংসা শুনিলে, আত্মহারা হইয়া যাইত। সেই কারণ, ক্ষীরোদার মুখে তাহার বাগানের কাঁচকলার সুখ্যাতি

শুনিয়া মুক্তকেশীর সে অন্যমনস্কভাব তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। মুক্তকেশী ক্ষিরোদাকে কহিল,—"চল, তোমায় সন্দেশ আর কাঁচকলা দিই-গে।"

"চল মা লক্ষী, আমায় চল।"—বলিয়া ক্ষিরোদা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস—বেলা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যের কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত। যে দিকে চাও, সেই দিকেই যেন সে কিরণ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। এখন রাস্তায় লোকজনের আর সেরূপ গতিবিধি নাই; সেই কারণ রাস্তাগুলিও যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে। মনুষ্য ও পশুপক্ষিগণের কোলাহল এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটা ফিরিওয়ালার কণ্ঠস্বরমাত্র শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল; তাহার মধ্যে একটা স্বর—বড় সপ্তমে উঠিতেছিল; সে তখন উচ্চকণ্ঠে প্রাণপণে ডাকিতেছিল,—"পাণি পিনে কা বরফ!"

আর চৌধুরী পাড়ায়—গোলক মুদী আহারান্তে এই সময় বেশ সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল। যেখানে পড়িতে আট্‌কাইতেছে, গোলক সেইখানে কেবল সুরের 'রেশ' টানিয়া যাইতেছে। গোলকের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর, সুতরাং সে রামায়ণ পাঠ অতি সুললিত হইতেছিল। তবে দুঃখের বিষয় এই, তখন সেখানে কেহ তাহার মনোমত শ্রোতা ছিল না। দোকানে এক জন শ্রোত্রী ছিল মাত্র। কিন্তু সে তখন পার্শ্বস্থ একখানি তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া, নাসিকাধ্বনি করি-

তেছিল। আর মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে গোলকের মস্তকের উপর এক টীয়া পক্ষী ঝুলিতেছিল। গোলকের সুললিত কণ্ঠোচ্চারিত রামায়ণ পাঠ শ্রবণে, তাহার কিন্তু কোন প্রকার মনোনিবেশ দেখা যায় নী, সে আপন দাঁড়ে বসিয়া কুটুর্ কুটুর্ ধান-ছোলা খাইতেছিল। গোলক পণ্যদ্রব্যাদির মধ্যস্থলে পাটা-তনে ঠেস দিয়া রামায়ণ পাঠে নিমগ্ন, আর তাহার ক্রোড়দেশে দিব্য পুষ্টিকান্তি দুগ্ধফেণনিভ শুভ্রাকার একটি মার্জ্জারী শয়ন করিয়াছিল। এই মার্জ্জারী সে পাঠ শুনিতেছিল কি না, জানি না; কিন্তু সেই তক্তপোষ-শায়িতা কুম্ভকর্ণমহিষীরূপিণী স্থূলকায়া স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার কোন নাসিকাধ্বনি ছিল না, সে বরং মধ্যে মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া গোলকের মুখের দিকে চাহিতে ছিল। আর প্রাণীর মধ্যে, শর্করা হাণ্ডির চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি আসিয়া বসিতেছিল; আর একটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের ভোম্রা, ভোঁ ভোঁ শব্দে যেন গোলকের রামায়ণ-গানের সুর মাটি রাখিতেছিল।

এমন সময় একজন খরিদ্দার আসিয়া এক সের লবণ চাহিল। সুতরাং গোলকের রামায়ণ-পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। পুস্তকের যে স্থল পড়িতেছিল, সেই স্থলের পাতার কোণ মুড়িয়া, গোলক পুস্তক-খানি রাখিল। তাহার পর চস্‌মাখানি খুলিয়াও, পুস্তকের উপর রাখিয়া দিল। কিন্তু লবণ ওজন করিতে গিয়া গোলক দেখিল যে লবণের পাত্রে লবণ নাই, সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গোলক বড় গোলে পড়িল, খরিদ্দারটা ফিরিয়া যাওয়া গোলকের প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। গোলক কি মনে করিয়া খরিদ্দারকে কহিল,—"দা-ঠাউর, লবণ টা শীঘ্রই পাঠাইয়ে দিচ্ছি;

আপনগার বাড়ী বইসেই পাবেন। এখন উত্তম কাশীর চিনি লয়ে যান, মা-ঠাউরেণ খুসী হয়ে যাবেন।”

খরিদ্দার তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—“সে কি গোলক ? নুন কিন্‌তে এসে কাশীর চিনি নিয়ে গেলে, তোমার মাঠাক্‌রুণ যে আমায় ঝাঁটা মার্‌তে আস্‌বে।”

গোলক।—আজ্ঞা না। আমি নিবেদন করছি·আপনি প্রণিধান করেন। যখন আমি—

এই সময় খরিদ্দার বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—“আর তোর নিবেদন প্রণিধানে কাজ নাই বাপু, এ রোদের চোটে আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না, শিগ্‌গীর নুন এনে একসের নুন আমাকে দিয়ে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিস্।”

গোলক তখন যোড়হস্তে বিনীতভাবে কহিল,—“এজ্ঞে এ অধীন যা কইচে, একবার প্রণিধান করে দেখ্‌বেন না? আপনি বেরাম্মন ঠাউর, আমার দোহানে এসে, শূন্যহস্তে ফিরে যাবেন কেম্‌নে? এই উত্তম কাশীর চিনি অন্যকে পঞ্চগণ্ডা পয়সা সের বিক্রয় করে থাকি; আপনাকে সাড়ে চারি আনায় দিব। আমার মাথার কীরে, লয়ে যান্ দা-ঠাউর, লয়ে যান্।”

খরিদ্দার তখন কহিলেন,—“তুই যখন ছাড়্‌বি না, তখন দে, আধসের চিনি দে, কিন্তু চার আনার বেশী আমি সের দেবো না।”

গোলকচন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইয়া চিনি ওজন করিয়া দিল। গোলকের এই এক বড় গুণ যে, সে কখনও খরিদ্দার ফিরাইত না, চারি আনা সেরের জিনিষ দুই আনা সের বলিলেও গোলক খরিদ্দার ফিরাইত না; কারণ গোলক সিদ্ধহস্ত! সে যাহাকে

যত ওজনের দ্রব্য দিবে মনে করিত, হাতের কায়দায়, তাহা করিতে পারিত। এদিকে গোলকের গলায় কিন্তু তুলসীমালা, মাথায় শিখা, নাকে তিলক; গোলক প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে।

খরিদ্দার বিদায় করিয়া গোলক পুনরায় রামায়ণ পাঠে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় রুদ্রাক্ষ-সুশোভিত বক্ষ, দীর্ঘশ্মশ্রুরাজি শোভিত মুখমণ্ডল, গৈরিক পরিহিত, এক সন্ন্যাসী সেই দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার্থী মনে করিয়া, গোলক তাড়াতাড়ি কহিল,—"যিয়া কুচ হোগা নেহি—সন্ন্যাসী ঠেউর!"

সন্ন্যাসী ঠাকুর কিন্তু বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় উত্তর দিলেন, "আমি তোমার কাছে কোন ভিক্ষার জন্য আসি নাই গোলক।"

গোলক মুদী ত একবারে অবাক্! তাহার প্রথম বিস্ময়ের কারণ, সন্ন্যাসী বাঙ্গালা কথা কহিতেছেন; আর দ্বিতীয় বিস্ময়ের কারণ, সন্ন্যাসী তাহার নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত। গোলক অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, এবং তাঁহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছে বলিয়া, তাহার মনে হইতে লাগিল। এই সময় একজন সন্ন্যাসীর বুজ্‌রুকীর কথা গোলকের মনে পড়িয়া গেল! সে সন্ন্যাসী, গোলককে সেই বুজ্‌রুকিতে সাড়ে তিনটি টাকা ঠকাইয়া ছিল। সেইরূপ পুনরায় প্রতারিত হইবার আশঙ্কা, গোলকের মনে উদয় হইল; গোলক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"শ্যাম, শ্যাম—ও শ্যাম।"

তখন উক্ত তক্তপোষের উপর প্রতিধ্বনিত সুদীর্ঘ নাসিকা-অকস্মাৎ থামিয়া গেল। সেই নিদ্রিতা স্ত্রীলোকটিও ধড়-

ধড়িয়া উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল,—"আমর্ মিন্সে! ষাঁড়ের মতন গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচিয়ে আমার এমন ঘুমটা ভাঙ্গালি?"

গোলক। এদিহে দ্যাহেন না—কে আইচেন। হালার পো হালা সন্নিসী ঠাউরের ফন্দি ক্যাম্‌নে বুঝবা?

সন্ন্যাসী।—এই শ্যামকে তুমি সাল্‌কে থেকে বাহির করে নিয়ে আস নয়?

গোলকচন্দ্র তখন রাগান্বিত হইয়া কহিল,—"কি কন?"

সন্ন্যাসী। এই শ্যামের জন্ম তোমায় ফৌজদারীতে পর্য্যন্ত পড়তে হয়েছিল গোলক।

গোলক। আরে চুপ দেহেন সন্নিসী ঠাউর। এহান হতে চলে যান কইছি।

শ্যামাসুন্দরী তখন গোলকচন্দ্রের উপর গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"আ-মর্ মিন্সে সন্নেসী ঠাকুরকে তুই তাড়িয়ে দিস্! একে ত তোর বুকে শূল্ বেদনা ধরেছে! এখনি সাপে ভস্ম হয়ে যাবি যে পোড়ার্ মুখো! দেক্‌তে পাচ্ছিস্ না—সব কথা ইনি হুবাহু বল্‌ছেন।"

তাহার পর শ্যামা, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে বসিতে আসন দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তখন গোলক-চন্দ্রেরও সন্ন্যাসীর উপর ভক্তি উথলিয়া উঠিল। গোলক একবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিল,—"ঠাউর, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করেন। আমি অতি অধমতারণ, তাই আপনাকে চেন্‌বার পারি নাই।"

তখন সেই 'অধমতারণকে' সন্ন্যাসী কহিলেন—"গোলক,

তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। তুমি আমার কথার উত্তর দাও। এই পাড়ার প্রসন্নকুমার মুখুর্য্যের নগেন ও সুরেশ নামে দুইটি ভাগনের ছিল, তুমি কি তাদের চিন্‌তে না?"

গোলক অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একবারে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আরে এই যে হামার সেই নগেন ঠাউর। শ্যামা—শ্যামা, তুই ঝটুসে মুখুর্য্যে বাড়ীতে সংবাদ দিয়ে আয়, আমি এই দা-ঠাউরের শ্রীচরণ ধরে পড়ে রয়লাম।"

শ্যামা সেই কথা শুনিয়া, তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর দিকে দৌড়িল। আর এদিকে আমাদের গোলকচন্দ্র সন্ন্যাসীর পদযুগল ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্যামাসুন্দরী একবারে অন্দরের মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া মুক্তকেশীকে এই শুভসংবাদ দিল। শ্যামার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ সংবাদে নিশ্চয়ই মুক্তকেশীর আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। এমন কি, এই শুভ সংবাদের জন্য শ্যামা পুরস্কারের আশা পর্য্যন্তও করিয়াছিল; কিন্তু শ্যামার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া মুক্তকেশীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মুখে কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া শ্যামা বুঝিতে পারিল যে, এ সংবাদ মুক্তকেশীর পক্ষে শুভ নহে। নগেন্দ্রনাথের দেশে প্রত্যাগমনে শ্যামার মনে এতদূর আহ্লাদ হইয়াছিল যে, মুক্তকেশীর এইরূপ ব্যবহারে তাহার উপর শ্যামার একটা জাতক্রোধ হইল। শ্যামা ব্যর্থমনোরথ হইয়া, তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতে যাইতেছিল—এমন সময় গুরুচরণ খানসামা এবং কামিনী-ঝি সে সংবাদে আহ্লাদে অধীর হইয়া শ্যামার নিকট দৌড়িয়া আসিল এবং নগেন্দ্র বাবুকে দেখিবার জন্য সাশ্রুনয়নে শ্যামার নিকট কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল। তখন শ্যামার আর মুক্তকেশীর উপর জাতক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইল না। শ্যামা, গুরুচরণ ও কামিনীকে

সঙ্গে লইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে দোকানের দিকে আসিতে লাগিল। রাস্তায় যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই এই শুভ সংবাদ দিল এবং যে এই সংবাদ শুনিল, সেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের সঙ্গে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে গামার সঙ্গে অনেকেই আসিল। এদিকে ইহার মধ্যেই দোকানেও লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। গুরুচরণ অনেক কষ্টে সেই লোকের জনতা ভেদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসীর চরণে আসিয়া লুটিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী গুরুচরণকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল,—"গুরুচরণ, তোমাকে যে চেনা যায় না, তুমি এত বুড়ো হয়ে পড়েছ? তোমার সে চেহারা কোথায় গেল?"

গুরুচরণ তখন চক্ষের জল মুছিয়া কহিল—"দাদা-বাবু, কর্ত্তা-বাবু স্বর্গে চলে গেছেন, আর তোমরাও আজ বার বচ্ছর সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছো; এতে গুরো যে আজও বেঁচে আছে—এই ঢের!"

এই সময় কামিনী-ঝি কহিল—"দাদা বাবু, আমায় চিন্‌তে পারো?"

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"কামিনীকে আর আমি চিন্‌তে পারি না? কামিনী কিন্তু এখনও সেই রকমই আছে; বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাই না; তবে পূর্ব্বের চেয়ে এখন একটু রোগা দেখ্‌ছি।"

এই সময় অভয়াচরণ ডাক্তার সেই গোলক মুদীর দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া সন্ন্যাসীর আপদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। এই সময় সন্ন্যাসী

"দাদা আমায় চিন্‌তে পারেন নাই ?"—বলিতে বলিতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। ডাক্তার বাবু প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন—"আপনি যখন সন্ন্যাসী, তখন আমাদের পূজনীয়—আপনি আমায় প্রণাম কর্‌তে আসেন কেন ?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—"সে কি দাদা ? আমি যে তোমার ছোট ভাই।"

অভয়। তুমি আমাদের সেই নগেন্দ্র কি না, তাহার প্রমাণ আগে তোমায় দিতে হবে ; তার পর, তোমায় ভাই বলে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো।

সন্ন্যাসী। কি প্রমাণ চান বলুন।

অভয়। তুমি যখন এখান হতে যাও, তখন ছেলেমানুষ ছিলে, সুতরাং অবয়বের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে ; আম্‌রা তোমায় না চিন্‌তে পারবারই কথা। আর তুমি যে আমাদের চিন্‌তে পেরেছ, এতেও তোমায় আমরা নগেন্দ্রনাথ বলে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বো না। এরূপ চিন্‌তে পারার আরো অনেক উপায় আছে। তোমায় অন্য প্রমাণ দিতে হবে।

এই সময় সেই জনতার মধ্যে দুইটি দল দেখা গেল। এই সন্ন্যাসীকে নগেন্দ্রনাথ বলিয়া এক দলের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা ডাক্তার বাবুর এই কথায় বড়ই চটিয়া গেল। শ্যামা-মুদিনী তাহাদের মধ্যে একজন, সে রাগে একবারে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। অন্য কেহ এরূপ কথা কহিলে, হয় ত এই দলের লোকে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইত ; কিন্তু ডাক্তার বাবুকে সকলেই সম্মান করিত, সুতরাং মুখে কোন কথা বলিতে কেহ আর সাহসী হইল না। মনে মনে কিন্তু অনেকেই

গালি দিতে লাগিল। অপর দলের লোকেরা ডাক্তার বাবুর এই কথায় বরং সন্তুষ্ট হইল এবং সন্ন্যাসী কি উত্তর দেন, তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"আমায় কি প্রমাণ দিতে হবে না বল্‌লে আমি কিরূপে জান্‌বো?"

অভয়। তুমি বাড়ী থেকে চলে যাবার ছ'মাস পূর্ব্বে তোমার কি কোন সাংঘাতিক পীড়া হয়েছিল?

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমার উরুস্তম্ভ হয়েছিল।"

অভয়। কে সে উরুস্তম্ভ অস্ত্র করে?

সন্ন্যাসী। আপ্‌নি অস্ত্র করেছিলেন।

অভয়। আরাম কর্‌লে তোমার মামা আমায় কি পুরস্কার দিয়েছিলেন—তোমার স্মরণ আছে কি?

সন্ন্যাসী। মামা আপ্‌নাকে একটী সোনার ঘড়ি দিয়েছিলেন।

অভয়। তোমার কথায় এখন আমার বিশ্বাস জন্মেছে, আর একটী কাজ কর্‌লে আর আমার কোন অবিশ্বাসই থাক্‌বে না। সে কাজ এত লোকের মাঝখানে কর্‌তে আমি বল্‌তে পারি না। তুমি একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে, তোমার উরুস্তম্ভের অস্ত্রের চিহ্ন আমায় দেখাতে হবে। একবার আমার বাড়ীতে এস।

এই কথায় সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে সেই অসংখ্য জনতাও চলিল। আমাদের গোলক মুদী ও শ্যামা

দোকানপাট বন্ধ করিয়া চলিল। বাড়ীতে পৌছিলে, যে গৃহে তিনি প্রতিদিন রোগীর ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, সেই গৃহে সন্ন্যাসীকে লইয়া গেলেন; অন্যান্য সকলে বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। লোকের ভয়ঙ্কর জনতা দেখিয়া ডাক্তার বাবু সেই গৃহের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই গৃহের মধ্যে ডাক্তার বাবুর অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, এদিকে বাহিরের সকলেও অধৈর্য্য হইতেছিল। একটা অস্ত্রের চিহ্ন দেখিতে কেন এত বিলম্ব হইতে লাগিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, ডাক্তার বাবু সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং আসিয়াই সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমার আর কোন সন্দেহই নাই। এই সন্ন্যাসীই আমাদের সেই নগেন্দ্রনাথ।"

তখন চারিদিকেই একটা আনন্দের ধ্বনি পড়িয়া গেল। যেন আজ সকলেরই কোন বিশেষ আত্মীয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের সেই প্রফুল্লমুখ দেখিয়া এইরূপ মনে হইতে লাগিল। এই সন্ন্যাসী সেই নগেন্দ্রনাথ কি না—এ সম্বন্ধে যে দুইটী দল ছিল, ডাক্তার বাবুর কথায় সেই দুইটী দল ভাঙ্গিয়া একদল হইয়া গেল—কারণ আর কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহই রহিল না। ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন, সন্ন্যাসী এখন আর সন্ন্যাসী রহিল না; বেশ-পরিবর্ত্তনের পর, সন্ন্যাসী তখন নগেন্দ্রনাথ হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এ নগেন্দ্রনাথের স্বদেশে প্রত্যাগমনের সংবাদ, তাঁহার শ্বশুরবাড়ী গিয়া পৌঁছিল। সে সংবাদ শুনিয়া, নির্ম্মলকুমারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিনয়কৃষ্ণ দৌড়িয়া, অভয়াচরণ বাবুর বাড়ী আসিলেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, বিনয় বাবু নগেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ শ্বশুরালয়ে যাইতে কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে বিনয় বাবু ক্ষুণ্নমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাড়ীতে সকলেই নগেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছিল, বিশেষতঃ নির্ম্মলের মাতা ত নগেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য একবারে পাগলিনী। গৃহিণীর এরূপ আগ্রহ দেখিয়া, নির্ম্মলের পিতা বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া সন্ধ্যার পরেই, ডাক্তার বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈঠকখানায় তখন পাড়ার অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ডাক্তার বাবুও সে স্থলে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নগেন্দ্রনাথকে লইয়া নানা রকম গল্প করিতেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখিয়া, সকলেই সসম্মানে আদর অভ্য-

র্থনা করিল। নগেন্দ্রনাথ শ্বশুর মহাশকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে দেখিয়া, দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। সাশ্রুনয়নে ব্রাহ্মণ নগেন্দ্রনাথের মস্তকে হস্ত বুলাইয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণের চক্ষের সেই আনন্দাশ্রু নগেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহের যে পরিচায়ক, সে কথা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। কিছুক্ষণ পরে, ব্রাহ্মণ প্রথমেই আরম্ভ করিলেন—"বাবা নগেন্দ্র, একবার আমাদের বাড়ী চল বাবা। তোমায় দেখ্‌বার জন্য সকলেই বড় অধীর হয়েছে।" নগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমায় ক্ষমা করুণ। আমি এখন আপনাদের বাড়ী যেতে পার্‌বো না।"

বিজয়। কেন বাবা, এমন কথা বল্‌ছ ?

নগেন্দ্র এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখ যেন শুকাইয়া গেল। তাহা দেখিয়া ডাক্তার বাবু কহিলেন—"নগেন্দ্র আজ বারো বৎসরের পর, দেশে ফিরে এসেছে, এখন কত লোক দেখ্‌তে আস্‌বে। এখন কি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে, বসে থাক্‌তে পারে বাঁড়ুয্যে মহাশয় ?"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় তখন কহিলেন—"বাবা বেশ কথা বলেছ, পাড়ার লোকে যাকে দেখ্‌বার জন্য অধীর, আম্‌রা তাকে দেখ্‌বার জন্য কত অধিক অধীর হয়েছি, তা একবার মনে ভেবে দেখ দেখি। এই বারো বৎসর আম্‌রা যে একবারে জীবন্মৃত হয়ে আছি বাবা।"

বলিতে বলিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ স্কন্ধস্থাপিত চাদরে সে অশ্রু মোচন করিলেন, এবং নগেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায়

কহিলেন, "বাবা, তুমি যখন আমার নির্ম্মলকে ভুলে বারো বৎসর বিবাগী হয়ে থাক্‌তে পেরেছ, তখন তুমি ত বাবা, সংসারের মায়া এক প্রকার কাটিয়েছ। কিন্তু আম্‌রা এখনও ঘোর সংসারী—মহা-পাপী, আমাদের প্রাণের ভিতর এই বারো বৎসর একটা রাবণের চিতা জ্বেলে দিয়ে চলে গিছ্‌লে বাবা। আমার নির্ম্মলের দিকে চাইলে—"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ এবার ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উপস্থিত সকলেই সে ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া নগেন্দ্র-নাথকে কহিল,—"তুমি যাও, আর দেরি কর না। ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখে, আমাদের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।"

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ কিছুতেই শ্বশুরালয়ে যাইতে স্বীকৃত হইল না! তাঁহার এই ব্যবহারে এক ডাক্তার বাবু ব্যতীত সকলেই বিস্মিত হইল! ডাক্তার বাবু কিন্তু এখনও নগেন্দ্রনাথকেই সমর্থন করিয়া কহিলেন—"বাঁড়ুয্যে মহাশয়, আপ্‌নি দুঃখিত হবেন না। নিজের বাড়ীতে না গিয়া, আপনার বাড়ী গেলে কথা জন্মিতে পারে। মুক্তকেশী কি রকম মেয়ে, তাত আপনি সকলই জানেন।"

বিজয়। জানি বাবা, কিন্তু জান্‌লে কি হবে—আমি বাড়ী গিয়ে, সেই মাগীকে কি করে বুঝাব তাই ভাব্‌ছি।

অভয়। যখন নগেন্দ্র দেশে ফিরে এসেছে, তখন তাঁরত আর কোন চিন্তা নাই। আজ না দেখেন, কাল্‌ দেখ্‌বেন।

বিজয়। আচ্ছা, তাই হবে। তবে এখন আমি আসি বাবা।

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে সেই বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন উপস্থিত ভদ্রলোকগণ এই বিষয়ের সমালো-চনা আরম্ভ করিয়া দিল। নগেন্দ্রনাথের কার্য্যটা যে ভাল হইল

না, অধিকাংশের মতে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এ সম্বন্ধে উপস্থিত সকলেই মত দিল, কিন্তু তাজ্জাম বাবু সে সময় নগেন্দ্রনাথকে সমর্থন করিলেও, এ সময় নগেন্দ্রনাথের মতের বিরোধীগণের বিপক্ষে একটিও কথা কহিলেন না। কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সে স্থান হইতে অন্দরে উঠিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

৺প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের উইল অনুসারে নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন এবং এখন সমস্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারও নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, এই সম্পত্তির নিকাশ দিবার সময়, এক্সিকিউটার অভয়াচরণ ডাক্তার অনেক টাকা ঋণী হইবেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা কেহই শুনিতে পাইল না। সুতরাং ডাক্তার বাবুর অমিতব্যয়িতার দরুণ, যাঁহাদের মনে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সে সন্দেহও দূর হইল। নগেন্দ্রনাথ এখন সমস্ত সম্পত্তি নিজ দখলে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তার বাবুও পূর্ব্বের ন্যায় সে সম্পত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

চৌধুরী পাড়ার মুখুর্য্যে-বাড়ী আবার অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বাড়ীর সংলগ্ন যে উদ্যান এতদিন অযত্নে শ্রীহীন হইয়াছিল, পুনরায় যত্নপারিপাট্যে তাহার সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দ্বিতলের সুসজ্জিত বৈঠকখানা ও 'হল ঘর' যাহা এতদিন প্রায় চাবি বন্ধ থাকিত, আবার তাহা আনন্দে ও উৎসবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। নিম্নতলের যে কাছারী গৃহ প্রায়ই জনমানব শূন্য থাকিত, এখন তাহা পুনরায় প্রতিদিন লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল।

বাড়ী ঘর সমস্তই মেরামত হইয়া গিয়াছিল ; গাড়ী, ঘোড়া, দাসদাসীর সংখ্যাও পূর্ব্বের ন্যায় এখন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। দেউড়ীতে এখন কেবল সেই রামসিং তেওয়ারী নাই, আরো তিন জন দ্বার-রক্ষক তাহার অধীনে নিযুক্ত হইয়াছে। গুরুচরণ খানসামাকে এখন আর স্বহস্তে কোন কার্য্যই করিতে হয় না, তাহার হুকুম পালনের জন্য এখন আরো চারিজন ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে। বহির্ব্বাটী পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ ও উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্দরবাটীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখনও সেইরূপ নিরানন্দই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। নগেন্দ্রনাথের বহির্ব্বাটী যেন দিবা, আর অন্দর বাটী যেন ঘোর অমানিশা! এক দিকে যেন আনন্দ, অপর দিকে বিষাদ! আনন্দ ও বিষাদের এরূপ সম্মিলন বোধ হয়, আর কখন হয় নাই!

কেন এমন হইল? নির্ম্মলকুমারী যাহার গৃহ-লক্ষ্মী, তাহার অন্দর এরূপ বিষাদময় কেন? বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায় যে, সে অন্দরে নির্ম্মলকুমারী নাই! নগেন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তি পাইয়া যেন, সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী নির্ম্মলকে ভুলিয়া গিয়াছেন! নগেন্দ্রনাথ শ্বশুরালয়ে গেলেন না, পত্নীকে নিজগৃহে আনিবার বিশেষ কোন চেষ্টাও করিলেন না! আর এক দিকে বিস্ময়কর ব্যাপার দেখুন—সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী সতীও পতিকে দেখিবার জন্য, সেরূপ কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না! এই ঘটনায় ক্রমে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল! কেহ নির্ম্মলকে দোষ দিতে লাগিল, কেহ বা নগেন্দ্রনাথকেই দোষী করিল। মুক্তকেশীর দুর্ব্ব্যবহারে নির্ম্মল সে বাড়ীতে জীবনে আর কখন আসিবে না বলিয়া, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ক্রমে সে কথাও ক্ষীরোদাসুন্দরী

দ্বারা প্রচার হইয়া পড়িল। তখন হইতেই, নির্ম্মলের স্বামী গৃহে না আসিবার কারণ, অনেকে অনুমান করিতে লাগিল। আর এক কথা—নগেন্দ্রনাথ বারো বৎসর পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া একবার শ্বশুরালয়ে গেলেন না, পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করিলেন না, পত্নীকে স্বগৃহে আনিবার জন্ত সেরূপ কোন যত্ন পর্য্যন্তও করিলেন না—ইহাতে নির্ম্মলের অভিমানই বা না হইবে কেন? কিন্তু নির্ম্মলের চরিত্র যাহারা বিশেষরূপে জানিত, তাহারা এ বিষয় যতই ভাবিত, ততই কেবল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত; প্রকৃত রহস্যভেদ কিছুই করিতে পারিত না!

অন্দরে পূর্ব্বের স্থায় মুক্তকেশীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপই রহিল। মুক্তকেশী যেখানে থাকিবে, সে স্থান স্বর্গতুল্য হইলেও শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইবে। সুতরাং অন্দরে সেই নিরানন্দ ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? নগেন্দ্রের আগমনে কামিনী-ঝির যে আনন্দ হইয়াছিল, এখন তাহা বিষাদে পরিণত হইল। এই ঘটনায় কামিনীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল; আর কষ্ট হইল, সেই বাঁদনী শ্যামার। তাহার কেন যে এত কষ্ট হইল, তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু একদিন এই শ্যামার পরামর্শে কামিনী নির্ম্মল-কুমারীর পিত্রালয়ে গিয়া উপস্থিত হইল এবং নির্ম্মলকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কামিনী কহিল,—"বউ-মা, তুমি কেন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌ছো? তোমার অমন সোণার সংসার ফেলে, কেন বাপের বাড়ীতে পড়ে রয়েছ? যে স্বোয়ামীর জন্যে তুমি তোমার নিজের শরীর মাটি করেছ, সেই স্বোয়ামীকে কি একবার দেখ্‌তেও তোমার সাধ হয় না? তোমার এই ব্যবহারে আমরা সবাই যে

একবারে অবাক্ হয়ে গেছি! তোমার কি এত ঐশ্বর্য্য—এত সুখভোগ কর্‌তেও ইচ্ছা হয় না?”

কামিনীর এই কথায় নির্ম্মলকুমারী একটু হাসিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ হাসে,নির্ম্মলকুমারী সেইরূপ হাসিল। ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন নৈশনভোমণ্ডল ক্ষণপ্রভার ক্ষীণ আভায় যেরূপ সুশোভিত হয়, সে হাসিতে নির্ম্মলের মুখমণ্ডলও সেইরূপ সুশোভিত হইল। তাহার পর একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল কহিল,—“কামিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে যখন সুখভোগ লেখেন নাই, তখন আমি এ ঐশ্বর্য্যভোগ কর্‌বো কিরূপে?”

কামিনী। কেবল অদেষ্টকে দোষ দিলে চল্‌বে কেন? তুমি নিজেই ত ইচ্ছে করে সব ত্যাগ করছো।

নির্ম্মল। অদৃষ্টে কোন সুখভোগ নাই বলেই আমার সে ইচ্ছা হয় না।

কামিনী। বউ-মা, আমার কাছে সব কথা সত্য বল। দিদিঠাকুরুণ সে বাড়ীতে আছে বলেই কি তুমি সেখানে যাচ্ছ না? তুমি নাকি দিব্যি করে এসেছ যে, আর সে বাড়ীতে যাবে না? রাগের মাথায় কোন দিব্যিই যদি করে থাকো, তাই বলে তুমি এমন সতীলক্ষ্মী হয়ে, আপনার স্বোয়ামীকে ত্যাগ কর্‌বে?”

নির্ম্মল কামিনী, আমি তোকে ঝির মত দেখি না, তোর কাছে সকল কথাই সত্য বল্‌বো। ভগবান যথার্থই আমার অদৃষ্টে স্বামী-সুখ লেখেন নাই। সকলে বলে যে আমার স্বামী বারো বৎসরের পর ঘরে ফিরে এসেছেন, কিন্তু যাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখ্‌বার জন্য, আমি আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি, এখন সে স্বামীকে দেখ্‌বার আমার আদৌ ইচ্ছা হওয়া দূরে থাক্,

আতঙ্কেই আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ধর্ম্ম স্বাক্ষী! কি জানি কেন আমার এখনও মনে হয়, আমার স্বামী যেন এখনও ঘরে ফিরে আসে নাই। ঠাকুর-ঝির উপর আমার কোন রাগই নাই, দিব্যি করেছি বলে যে স্বামী গৃহে যাই নাই তাও নয়। দেশশুদ্ধ লোক যাঁকে স্বচক্ষে দেখে, আমার স্বামী বলে স্বীকার করেছেন, আমি না দেখে, তাঁকে আমার স্বামী নয় বল্‌বো কি করে কামিনী? কেন আমার মনে এমন হয়, তা সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। স্বামী আমায় নিতে আসেন না বলেও তাঁহার প্রতি আমার কোন অভিমানও নাই, সে অভিমান কাকে বলে, তাও আমি জানি না। তাই, কাকেও কোন দোষে দোষী না করে, আমি কেবল আমার অদৃষ্টকে দোষ দি। আমার মতন অদৃষ্ট আর কার আছে কামিনী?"

বলিতে বলিতে জলপোরা ফুলের ন্যায় নির্ম্মলকুমারীর নয়নযুগল হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া কয়েকবিন্দু অশ্রু পতন হইল। আপনার বস্ত্রাঞ্চলে সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া, কামিনী বিষণ্ণমনে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলকুমারীর পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, কামিনী শ্যামার সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং তাহার নিকট প্রকাশ না করিল, তাহাকে বিশেষ কোন গোপনীয় কথা বলিবে কহিল। গোপনীয় কথার নাম শুনিয়া, শ্যামা একবারে লাফাইয়া উঠিল, এবং সে কথা শুনিবার জন্য একবারে অধীর হইয়া পড়িল। তাহার এরূপ আগ্রহ দেখিয়া, তখন কামিনী কি ভাবিয়া আবার ইতস্তত করিতে লাগিল। শ্যামার কিন্তু তখন আর বিলম্ব সহ্য হয় না, সে কথা গোপন রাখিতে, নানারূপ শপথ করিতে লাগিল।

তখন কামিনী এদিক-ওদিক চাহিয়া শ্যামাকে এক নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া কহিল—"বল্‌তে আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌ছে, কেন মর্‌তে বৌ-মার কাছে গিয়েছিলুম্, তার কথা শুনে আমার প্রাণ একবারে উড়ে গেছে, এখন মনে হয়—"

শ্যামা তখন কথাটা শুনিবার জন্য একবারে অধীর, সুতরাং কামিনীর গৌরচন্দ্রিকায় বাধা দিয়া কহিল—"আ মর্ মাগী, কথাটা কি আগে বল্‌না।"

কামিনী। বল্‌বো কি দিদি, সে কথা পিগ্‌গীর মুখে আসে না। যাকে সতীসাবিত্রী বলে এতদিন জান্‌তুম্, তারই মুখে এই

কথা! আমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেছি—যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছি!"

কথাটা শুনিবার জন্য তখন শ্যামার সেই আগ্রহ একবারে সপ্তমে উঠিল। শ্যামা সেই আগ্রহে অধীর হইয়া চীৎকার ছাড়িল—"কথাটা কি আগে বল্।"

কামিনী। আ মর্, তুই অত চেঁচাস্ কেন?

শ্যামা তখন বিনীতভাবে কহিল, "তোর পায়ে পড়ি দিদি, কথাটা আগে বল্, তার পর তুই আমায় দু-ঘা মেরেও আমার কোন দুঃখ থাক্‌বে না।"

কামিনী। বউ-মাকে যে এত ভাল বলে জানতুম্, সেটা ঠিক্ নয়। স্বোয়ামীর পিতি তার আদৌ মন নেই দিদি, আদৌ মন নেই। দিদিঠাক্‌রুণের ওপর কোন রাগই নেই, স্বোয়ামীর ওপরই তার হতশ্রদ্ধা! বলে কি—জানিস্ দিদি, স্বোয়ামীকে দেখ্‌তে তার আদৌ ইচ্ছে হয় না,—স্বোয়ামীর নাম শুন্‌লে তার প্রাণে কেমন ভয় হয়। আর একটা কথা যা বলেছে, তা আর আমি মুখে আন্‌তে পার্‌বো না।

শ্যামা। তুই বলিস্ কি-লো কামিনী! তার কথা শুনে আমারও যে হাত-পা আস্‌ছে নে! ভদ্রঘরের মেয়ের মুখে এই কথা! স্বোয়ামীর চেয়ে পিথিবীতে আর কি কিছু আছে? কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে এসে, এখন সে কথা আমি বেশ বুঝেছি—আমি একজন ভুক্তভোগী। যাক্ আর একটা কথা কি বলেছে বল্‌না ভাই।

কামিনী। তোকে যখন সব বল্লুম, তখন আর সে কথাটা বাকি রাখ্‌বো কেন? কথাটা কিন্তু বড় ভয়ানক!

শ্যামা অধীরা হইয়া কহিল,—"তবে শীগ্‌গীর বল্—কামিনী শীগ্‌গীর বল্।"

কামিনী। বল্‌ছি দিদি—বল্‌ছি। বউ-মার এখনও মনে হয়—এ স্বোয়ামী তার আসল সোয়ামী নয়! তার মনে হয়, এখনও তার স্বোয়ামী ঘরে ফিরে আসে নেই!

শ্যামা তখন একবারে সাশ্চর্য্যে গালে হাত দিয়া কহিল,—"তুই বলিস্ কি-লো কামিনী!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া কিন্তু কামিনীর বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, কামিনীর মুখ যেন শুকাইয়া গেল। একটা ভয়ঙ্কর দুষ্কার্য্য করিলে, মনের অবস্থা যেরূপ হয়, কামিনীর মনের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। কামিনী চুপি চুপি শুষ্ককণ্ঠে শ্যামাকে কহিল,—"কারো কাছে যেন প্রকাশ করো না দিদি!"

শ্যামা। তুই কি ক্ষেপিছিস্! এ কথা কি কারো কাছে মুখে আনা যায়?

তাহার পর বিষন্নমনে ধীরে ধীরে কামিনী সে স্থান হইতে চলিয়া গেল তখন শ্যামার মনের ভিতর কথাটা বড়ই তোল-পাড় হইতে লাগিল।

তখন মুক্তকেশীর উপর শ্যামার যে রাগ ছিল, সেই রাগ একবারে দ্বিগুণ হইয়া নির্ম্মলকুমারীর উপর গিয়া পড়িল। কারণ শ্যামা বড় আশায় আজ নিরাশ হইয়াছে। মুক্তকেশীর উপর প্রতিশোধ লওয়া তাহার আর হইল না, কিন্তু যাহার জন্য হইল না, এখন তাহার উপরই শ্যামার জাতক্রোধ হইল। আর বিশে-ষতঃ নির্ম্মলকুমারীর নির্ম্মল চরিত্রের উপর শ্যামার বিশেষ সন্দেহও হইয়াছিল। শ্যামা নিজে কু-চরিত্রা হইলেও, কু-চরিত্রা স্ত্রীলোকের

উপর শ্যামা একবারে হাড়ে-চটা। ঝি মহলে যে সকল ঝি কু-চরিত্রা, শ্যামা তাহাদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। অনেক ঝির চরিত্র শ্যামা নিজের জীবন-কাহিনী শুনাইয়া, নষ্ট হইতে দেয় নাই। স্ত্রীলোকের চরিত্র যাহাতে কোনরূপে নষ্ট না হয়, শ্যামার জীবনের ব্রত ইহাই। এই কারণ, নির্ম্মলের সেই নির্ম্মল চরিত্রের উপর শ্যামার যখন সন্দেহ হইল, তখন শ্যামার আর ক্রোধের সীমা রহিল না।

এখন কামিনীর মুখে শ্যামা যে কথা শুনিয়াছিল, তাহা আর প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, শ্যামা তাহার জন্য শপথ করিয়াছে। শ্যামার মতে ইহাই স্থির নিশ্চয় ছিল বটে, কিন্তু নির্ম্মলের উপর ক্রোধের মাত্রা অধিক হওয়ায়, শ্যামা ক্রোধভরে সে প্রতিজ্ঞা ও শপথ ভুলিয়া গেল! প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যতক্ষণ কথাটা চাপিয়া রাখিতে পারিল, ততক্ষণ কথাটা চাপাই রহিল। কিন্তু শেষে শ্যামা দেখিল যে, এ কথা চাপা রাখিতে গিয়া, শ্যামার বুঝি প্রাণ যায়, তখন নিজের প্রাণ-রক্ষার জন্য হঠাৎ ক্রোধভরে সে কথাটা একজন ঝির নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিল! শ্যামা কামিনীর নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই সমস্ত বলিল। কিন্তু সেই ঝি, অতিরঞ্জিত করিয়া, সেই কথা পাড়ায় পাড়ায় সংবাদ দিয়া আসিল। তখন নির্ম্মলের চরিত্র সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব কাহিনী গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মুখুর্য্যেদের খিড়কীর পুষ্করিণীর ঘাটে আজ পাড়ার অনেক-গুলি স্ত্রীলোক সমবেত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা তৈলাক্ত-দেহে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া দন্তমার্জ্জনা করিতেছে। সকলেই কোন না কোন কার্য্যে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যাহাদের নিকটস্থ অন্য পুষ্করিণীতে যাইলে সুবিধা হইত, আজ তাহারাও যেন সে সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া, মুখুর্য্যেদের খিড়কীর পুষ্করিণীতে আসিয়াছে। সুতরাং আজ এই ঘাটে মেয়ে-মহলের একটা বিরাট সভা বসিয়াছে। সে সভায় বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেরই শুভাগমন হইয়াছিল, এবং কোন এক বিষয়ে একটা ভয়ঙ্কর আন্দোলনও চলিতে ছিল।

অতি প্রত্যূষকাল হইতেই একে একে সকলে সমবেত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদের বিশেষ পরিচিতা ক্ষিরোদা সুন্দরী আজ এ সভার বক্তা বা সভাপতির আসন নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। কারণ মুক্তকেশী তাহার হস্তগত বলিয়া, এখন স্ত্রী-মহলে তাহার পসার-প্রতিপত্তি বিলক্ষণ বাড়িয়াছিল, তবে মনে মনে সকলেই তাহাকে গালি দিত, কেবল কোন্দলের ভয়ে কেহ তাহাকে কোন কথা বলিতে পারিত না। ক্ষিরোদা সেই ঘাটে

উপস্থিত হইবামাত্র, সভাস্থলে একজন সম্মানীয় লোক উপস্থিত হইলে, যেরূপ সভা একটু স্থিরভাব ধারণ করে, পরস্পরের কথা-বার্ত্তা ও হাসি-তামাসা থামিয়া যায়, ক্ষিরোদার এই সভায় উপস্থিতিতেও সেইরূপ ঘটিল। কেহ কোন প্রস্তাব করিল না, কেহ সে প্রস্তাব সমর্থনও করিল না, অথচ ক্ষিরোদা আসিয়াই সেই মেয়ে-সভার বক্তা বা সভাপতির আসন একবারে দখল করিয়া বসিল। ক্ষিরোদার সে সময় তৈলাক্ত দেহ, আলুলায়িত কেশগুচ্ছ, লম্বমান গামছা সুশোভিতস্কন্ধ। এই অপূর্ব্ববেশে দন্তমার্জ্জন করিতে করিতে আমাদের ক্ষিরোদাসুন্দরী সেই ঘাট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহার কস্ বহিয়া কৃষ্ণবর্ণ লালাও নিঃসৃত হইতেছিল, সুতরাং তাহার মুখশ্রীও এক অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিল! ক্ষিরোদা আসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনমুখী কোন রমণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"বলি ও নাপ্‌তে বউ, আজ যে তুই এত বাসন মাজছিস্, কাল্ তোদের বাড়ী কেউ জামাই-কুটুম, এসেছিল নাকি?"

নাপিত-বধূ তখন অবনতমস্তক ঈষৎ উন্নত করিল। একটু ঘোমটাও টানিল। প্রফুল্লমুখে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল,—"না দিদি-ঠাকরুণ, অন্য কেউ আসে-নি। আজ আমার ঘাড়েই সব বাসন মাজা পড়েছে, তাই অনেক বাসন হয়েছে।"

ক্ষিরোদার দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল—"কাল্ তোদের কি রান্না হয়েছিল গো?"

নাপিত-বধূ তখন ধীরে ধীরে ও ভয়ে ভয়ে সে পরিচয়ও দিল। এমন সময়, মুক্তকেশী সেই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুক্ত-কেশীকে দেখিয়া, ক্ষিরোদা তখন এই সকল বাজে কথা ছাড়িয়া

পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। ক্ষিরোদা আরম্ভ করিল—"ও মুক্ত, ঘেন্নায় যে মরে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে। সকল পাড়াতেই যে তোদের কালামুখী বউয়ের কথা তোলাপাড়া হচ্ছে। ঐ যে যারা সবাই বল্‌তো—এমন ভাল বউ আর জন্মায়-নে, সে আবাগী ভালখাগীদের মুখটা এখন কোথায় রইলো? তাদের পোড়ার মুখে এখন আমার যে নুড়ো জেলে দিতে ইচ্ছে করছে। যে যাই বলুক, মেয়ের সেরা মেয়ে বাছা তুমি—তোমার সাম্‌নে বলা নয়, তোমার মতন মেয়ে আমাদের আর এ গ্রামে নেই। কালামুখীর তরে যে গ্রামে তোমারও মুখ দেখান ভার হ'লো মা।"

শেষের কথায় মুক্তকেশী যেন একটু বিরক্তভাবে কহিল,—"আমার মুখ দেখান ভার হবে কেন?"

ক্ষিরোদার মেয়ে মহলে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হইলেও মুক্তকেশীর এই কথায় যেন একটু থতমত খাইয়া গেল এবং আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল—" আমিও তাই বলি মা, এতে তোমার আর কি কিসের লজ্জা? তুমি ঢাক বাজিয়ে গ্রামের মধ্যি দিয়ে চলে যেতে পার। তবে কি জান, তোমাদের বাড়ীর বউ, ছেলের বউ না হক্‌, ভাগ্‌নের বউ। তার চরিত্তির এ রকম হলে, অবিশ্যি একটু—কি জান—মাথা হেট—"

মুক্তকেশী সে কথায়ও বাধা দিয়া পুনরায় বিরক্তভাবে কহিল—"আমার মাথা কিসে হেঁট হবে?"

তখন ক্ষিরোদাসুন্দরী একবারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"বালাই! শত্রুর মাথা হেঁট হক। তুমি—যে বাপের মেয়ে মা, তাতে কি আর তোমার মাথা হেঁট হবার যো আছে? মাথা

হেঁট তোমাদের বউয়ের মা-বাপেরই হয়েছে। যখন কামিনীর কাছে এমন সব কথা বল্‌ছে, তখন ঐ মেয়েকে আর বাড়ীতে রাখাই ভার হবে। দেখ না, কোন্ দিন কুলে কালি দিয়ে, ঘর থেকে চলে যায়।"

মুক্তকেশী। কুলে কালি দেবার আর বাকি রেখেছে কি? আম্‌রা তার উপায় আগে থেকেই কর্‌ছি। ডাক্তারের স্ত্রী সৌদামিনীর ছোট বোন্‌কে দেখেছ কি? সেই মেয়েটির সঙ্গে নগেনের আবার বিয়ে দিচ্ছি।

ক্ষিরো। কে—কমলীর সঙ্গে? তা বেশ হবে। মেয়েটি দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল, আর এদিকেও ডাগরডোগর বটে।

মুক্ত। দেখ্—ডাক্তারের এখন সে দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে। কাল্ এর জন্য আমায় কত মিনতি করে যে বল্লে, তা তোমায় আর কি বল্‌বো? বলে—'তুমি এ বিয়েতে মত না দিলে, আমি বিয়ে দেবো না—এবার বউ এসে, তোমায় দাসীর মতন সেবা কর্‌বে।"

এই সময় কামিনীর-মা মাজা-বাসনগুলি সিঁড়িতে রাখিয়া কহিল—"বলি হাঁ মুক্ত, এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে?"

মুক্ত। কেন ভাল হবে না! ও বউ নিয়ে আর আম্‌রা যখন ঘর কর্‌বো না, তখন না বিয়ে দিলে আমাদের চল্‌বে কেন?

এমন সময় চারুবালা বলিল—"এ বিয়ের ঘটক কে পিসী-মা?"

পিসী-মা তখন একটু গম্ভীরভাবে কহিল—"ঘটক আবার কে হবে? যার সঙ্গে যার ভবিতব্য তা কি কেউ রদ কর্‌তে পারে?"

চারু। পিসী-মা, এমন কাজ করো না। তুমি মনে কর্‌লে সবই কর্‌তে পার। তুমি যদি তোমাদের বউকে একবার ডাক, তা হলে সে কখনই তোমার কথা ফেল্‌তে পার্‌বে না। খুড়ী-মা সতীলক্ষ্মী, তবে কেন যে খুড়ী-মা স্বামীর ঘর কর্‌তে আস্‌ছে না—তা ভগবানই জানেন। কিন্তু তুমি ডাক্‌লে নিশ্চয়ই আস্‌বে।"

এই সময় কে গাহিল :—

"সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া,
তার কাছে ত যম যাবে না।
মন তুমি এ আর বুঝ্‌লে না।

সকলই বিস্মিত হইয়া যে দিক হইতে সেই সুললিত কণ্ঠস্বর আসিতেছিল, তখন সেই দিকে চাহিল। এই গানটা মুক্তকেশীর প্রাণে—কি জানি কেন—বড় আঘাত করিয়াছিল, সেই কারণ মুক্তকেশী একবার রোষকষায়িতনেত্রে সেই গায়কের প্রতি চাহিল। দেখিল—এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র—মাথায় ছিন্ন মলিন বস্ত্রের পাগ্‌ড়ী—গলায় হাড়ের মালা—হস্তে ও কটিবন্ধে লতাপুষ্পরচিত অলঙ্কার-বিশেষ! এক অপূর্ব্ব বেশে—এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

মুক্তকেশীর রোষকষায়িতনেত্র দেখিয়া গিরোদাসুন্দরী তাহার উপর গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"তুই পোড়ারমুখো কেরে?"

তখন কামিনীর-মা কহিল—"ওগো, ওর নাম খগা-পাগ্‌লা। আহা! কোন্ অবাগীর ছেলে, এখন পাগল হয়ে, রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্ছে।"

সেই পাগল দেখিয়া মুক্তকেশীর কিন্তু মুখ শুকাইয়া গেল।

তাহার প্রাণের ভিতর কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল! কিন্তু মুখে কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। এক জন দরোয়ানকে ডাকিবার জন্য মুক্ত-কেশী তাড়াতাড়ি তখন সে স্থান হইতে দৌড়িয়া অন্দরে প্রবেশ করিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অভয়াচরণ ডাক্তার. আজ নির্ম্মলকুমারীর পিতা বিজয়কৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছেন। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া সকলেই বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিল। কর্ত্তা মহাশয় স্বয়ং তাঁহাকে নিজের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইলেন এবং যথাসাধ্য তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তাও হইতে লাগিল, কিন্তু সে সকল কথার জন্ম যে ডাক্তার বাবুর শুভাগমন হয় নাই, কর্ত্তা তাহা বুঝিতে পারিলেন। আর তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার কন্যা ও জামাতা সম্বন্ধীয় কোন কথা লইয়াই, ডাক্তার বাবুর এই শুভাগমন হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বাবুকে সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে না দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন এবং অনেকক্ষণ সে প্রতীক্ষায়ও রহিলেন। শেষে নিজেই কহিলেন—"তবে ডাক্তার বাবু, আজ কি মনে করে—আমার বাটীতে তোমার শুভাগমন হলো?"

ডাক্তার। আজ একটা কথা আপনাকে বল্‌বো বলেই এখানে এসেছি—কিন্তু সে কথাটা বল্‌বো বল্‌বো করে, আর বল্‌তে পাচ্ছি না।

কর্ত্তা। যে কথা বল্‌বে বলে এখানে এসেছ, সে কথা

বল্‌বার কি বাধা আছে বাবা? তুমি স্বচ্ছন্দে সে কথা আমায় বল্‌তে পার।

ডাক্তার। কথাটা শুন্‌লে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন না, সেই জন্য আমি একটু ইতস্তত কর্‌ছি।

কর্ত্তা। সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়া সেটা আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু তোমায় বাবা, সে কথা বল্‌তেই হবে।

ডাক্তার। আজ্ঞে, তবে আপনাকে বলি। আপনার কন্যা, নগেন্দ্রের উপর কি জানি কেন সন্তুষ্ট নন। এমন কি তিনি কামিনী-ঝির নিকট স্পষ্টই বলেছেন যে, তিনি স্বামীর গৃহে যাবেন না। একটা ঝির মুখে সে কথা শুনে, কোন কাজ করা উচিত নয় বলে, আমি নিজেই সে কথা জান্‌তে এসেছি। যদি একান্তই আপনার কন্যা নগেন্দ্রকে স্বামীরূপে গ্রহণ না করেন, তবে নগেন্দ্র পুনরায় বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এখন আপনি আপনার কন্যার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা জেনে আমায় বলুন।

ডাক্তার বাবুর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর, এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, —"বাবা, তুমি একটু অপেক্ষা কর; আমি একবার আমার কন্যার অভিপ্রায় জেনে আসি।"

এই কথা বলিয়া,ব্রাহ্মণ সে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, এবং অন্তঃপুরে আসিয়া গৃহিণীকে এই সংবাদ জানাইলেন। গৃহিণী সে সংবাদ শুনিয়া, একবারে চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর, কন্যার নিকট গিয়া সেই অশুভ সংবাদ তাহাকে জানাইল। নির্ম্মলকুমারী জননীর মুখে সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ

নীরবে থাকিল,—তাহার পর কহিল,—"মা, আমার প্রাণ থাকতে আমি স্বামীর কাছে যাব না। তিনি বিবাহ করুন, আর যা-ইচ্ছে তাই করুন—এতে আমার কোন আপত্তিই নাই।"

নির্ম্মলকুমারীর জননী সে কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"তোর মুখে এই কথা মা! তোকে গর্ব্ভে ধরে, আমার যে লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হলো!"

নির্ম্মল। আমার মুখে এই কথাই মা। আমার প্রাণ যাকে চায় না, কি বলে তার কাছে যাবো? মা, তুমি সতীলক্ষ্মী, আমি তোমারই গর্ব্ভে জন্মেছি—লোকে আমার নিন্দে করছে করুক—আমি সে লোক-নিন্দাকেও ভয় করি না।

জননী। নির্ম্মল, এখন আমার দুঃখ হচ্ছে—কেন তোকে আমার গর্ব্ভে স্থান দিয়েছিলুম। যদি স্থানই দিয়ে থাকি, তবে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে, তোকে মেরে ফেলিনি কেন? স্বামীর চে'য় এ পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের আর কে আছে? যে মেয়ে স্বামীর অবাধ্য—স্বামীর মুখ দেখতে চায় না—গুরুজনের কথা শোনে না, তার মৃত্যু ভাল—আমি মা হয়ে বলছি—তার মৃত্যুই ভাল।

জননী উত্তেজিত স্বরে উপরোক্ত কথা কয়েকটী কহিলেন। সে কথা শুনিয়া, নির্ম্মল কুমারী কিন্তু কোনরূপ উত্তেজিত হইল না। নির্ম্মল সাশ্রুনয়নে ধীর ও স্থিরভাবে কহিল,—"মা, আমার মৃত্যুই ভাল। কিন্তু সে মৃত্যু যে হয় না, কি করি মা? আশীর্ব্বাদ কর মা, আমার মৃত্যু যেন শীগ্‌গীর হয়। এই মৃত্যু কামনা ভিন্ন এখন আমার আর যে কোন কামনাই নাই মা।"

নির্ম্মলকুমারীর সেই হৃদয়ভেদী সকরুণ কথায়, জননীর প্রাণ

যেন একেবারে ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। জননী নির্ম্মলকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"মা, মা, তুই কি মা আমার সেই নির্ম্মল?"

জননীর অশ্রুধারা মুছাইতে মুছাইতে নির্ম্মলকুমারী কহিল,—"না মা আমি তোমার সে নির্ম্মল নই। তুমি মনে কর,—তোমার সে নির্ম্মল মরে গেছে।"

"বালাই!" বলিয়া জননী নির্ম্মলকুমারীর মুখ-চুম্বন করিলেন। নির্ম্মল জননীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জননীর অশ্রুতেও নির্ম্মলের অঙ্গ সিক্ত হইতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া মাতা ও কন্যা এইরূপে কাঁদিল। তাহার পর জননী কহিল—"কর্ত্তাকে গিয়ে কি বল্‌বো মা?"

নির্ম্মল সেইরূপ ধীর ও স্থিরভাবে কহিল—"বাবাকে বলো, আমার মতন দুঃখিনী আর এ পৃথিবীতে নাই। দুঃখ ভোগ করবার জন্যই আমার জন্ম। সকলের ঘৃণা, নিন্দা, তিরস্কার আমি ম্লানবদনে সহ্য করবো। কেউ বিয়ে করতে চায়, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

জননী। কেমন করে, এ প্রাণ থাকতে, এ কথা মুখে বলবো?

এই কয়েকটী কথা বলিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে জননী কর্ত্তাকে গিয়া সংবাদ দিলেন। সে কথা শুনিয়া কর্ত্তা একবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন, এবং—"অমন কন্যার মুখ দর্শন করতে চাই না"—বলিতে বলিতে একবারে সদর বাড়ীতে আসিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ তখন ক্রোধে একবারে অধীর, ক্রোধভরে ডাক্তার বাবুর নিকট কন্যাকে অজস্র

গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার বাবু কিন্তু সে সংবাদে কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। তিনি বরং কর্ত্তাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়—এর জন্য আপ্‌নার কন্যার উপর কোনরূপ দোষারোপ করবেন না। আমাদের ডাক্তারী পুস্তকে এরূপ ঘটনার কথা আম্‌রা অনেক পড়েছি। মানুষ যে জিনিস পাবার জন্য বহুকাল ধরে অধীর হয়ে থাকে, সে জিনিস পেলে, তাতে তখন আর তার কোন স্পৃহা থাকে না। ক্রমাগত নিরাশ হয়ে হয়ে, মনোবৃত্তি তখন একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে। এটি আপ্‌নার কন্যার মনোবৃত্তি সম্বন্ধীয় একটি রোগ বলে জান্‌বেন।"

কর্ত্তা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "এ রোগের কি কোন চিকিৎসা নাই বাবা?"

ডাক্তার। চিকিৎসা আছে, কিন্তু আরোগ্য হতে অনেক সময় লাগ্‌বে। আমি আপ্‌নার কন্যার জন্য আজই ঔষধ পাঠিয়ে দেবো।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি বিদায়-গ্রহণ করিলেন। কর্ত্তা অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রনাথের সহিত সৌদামিনীর ছোট ভগিনী কমলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বাবুই এ বিবাহের প্রধান উদ্যোগী। এই ঘটনায় পিসী-মাতার আহ্লাদের সীমা ছিল না। তাঁহার কমলা যে এত সুখ ও ঐশ্বর্য্যভোগ করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। সুতরাং কমলার এ বিবাহে তিনি আশাতীত সুখলাভ করিয়াছিলেন। তবে কেবল ঐশ্বর্য্যলোভে সতীনের উপর ভগিনীর বিবাহ দিতে, সৌদামিনীর প্রথমে মত ছিল না; কিন্তু ডাক্তার বাবুর যখন নিতান্তই অভিলাষ হইল, তখন সৌদামিনী অগত্যা এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। সৌদামিনী সম্মত হইলে, আর এ বিবাহে কোনরূপ প্রতিবন্ধক রহিল না। ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতেই বিবাহ হইয়া গেল। যাহা কিছু ব্যয় হইল, তাহা ডাক্তার বাবুই সমস্ত বহন করিলেন। তবে কন্যার বিবাহে, আজ কাল যেরূপ ব্যয় হইয়া থাকে, তাঁহাকে সেরূপ কোন ব্যয় এ বিবাহে করিতে হয় নাই। এ বিবাহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ হইয়াছিল—আমাদের জানকীনাথের। এক ভগিনীপতিতে রক্ষা ছিল না, এখন আবার তাহার দুইজন ধনবান ভগিনীপতি হইল!

বিবাহের পর হইতেই, কমলা নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিয়া

বাস করিতে লাগিল; পিত্রালয়ে বা ভগিনীর গৃহে আর গেল না। প্রথম প্রথম মুক্তকেশী কমলাকে বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল এবং কমলাও তাহার বড় অনুগত হইল। কিন্তু এ ভাবে অধিক দিন কাটিল না; মুক্তকেশীর সহিত কমলার ক্রমেই ঠোকাঠোকী আরম্ভ হইল। প্রথম মনান্তরের কারণ হইল—কমলার সেই অশেষ গুণালঙ্কৃত আমাদের জানকীনাথ। মুক্তকেশী জানকীনাথকে দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না, এমন কি, তাহাকে দেখিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। ক্ষিরোদা সকল কার্য্যেই মুক্তকেশীর সাহায্য করিত, সুতরাং জানকীনাথের সহিত প্রায়ই ক্ষিরোদার কোন্দল বাধিত। জানকীনাথও কোমর বাঁধিয়া ক্ষিরোদার সহিত কোন্দল করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। এই ঘটনায় প্রথমে কমলার মনে মুক্তকেশীর উপর বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হইল। কমলার বয়ঃক্রম এখন ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র, কিন্তু এই ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই, সে আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে জানিত, এ সমস্ত বাড়ী-ঘর সুখৈশ্চর্য্যসকলই তাহার,—সে এই গৃহের গৃহিণী। সুতরাং মুক্তাকেশীর অধীন হইয়া, সে আপনার গৃহে থাকিবে কেন? আর কমলার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সে কাহার অধীন হইয়া থাকিবার মেয়ে নয়। বিশেষতঃ তাহার সহোদর ভ্রাতার প্রতি মুক্তকেশী যখন এরূপ ব্যবহার করে, তখন কমলা মনে মনে স্থির করিল যে, মুক্তকেশীকে বাড়ী হইতে না তাড়াইলে, আর সে নিষ্কণ্টকে এ ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে পারিবে না। সেই কারণ, স্বামীর নিকট এই মুক্তাকেশীর বিপক্ষে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। একদিন রাত্রে, স্বামী স্ত্রীতে এ সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল:—

নগেন্দ্র। তোমার মনটা আজ ভার ভার দেখছি কেন কমল? আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কচ্চ না কেন? আজ আবার কি হয়েছে?

কমলা। কি আর হবে? আমি আর এ বাটীতে থাকতে পারবো না—আমায় বাপের বাড়ী—কি দিদির বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

নগেন্দ্র। কি হয়েছে বল না।

কমলা। আমি কারও কথা সহ্য করতে পারবো না। রোজ রোজ দল বেঁধে, আমায় যে যাচ্ছে তাই বলবে—আমি তা কেন সহ্য করবো?

ক্রোধ ও অভিমানের সহিত কমলার শেষের কয়েকটি কথায় একটু করুণরসও মিশ্রিত হইল, তখন সেই করুণরসের কণামাত্রতেই নগেন্দ্রনাথের উপর আশ্চর্য্য কার্য্য করিল। নগেন্দ্রনাথ কহিল—"দিদির দিন দিন বড় আস্পর্দ্ধা বাড়ছে বটে, আমি শীঘ্রই তার প্রতিকার করছি। হিংসা-দ্বেষে ত তাঁর শরীরখানি একবারে পরিপূর্ণ। অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর সহ্য করবো না।

কমলা। আবার কেমন মন্ত্রিটী জুটেছে দেখেছ?

নগেন্দ্র। কে?—ক্ষিরো-মাসী? ও বেটী ত পাজীর এক শেষ—অমন কুঁচুলে স্ত্রীলোক বোধ হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেও দেখতে পাওয়া যায় না। না—আর তার কুঁচুলকে ভয় করলে চলবে না, আমি কাল থেকে আমার বাড়ী তার আসা বন্ধ করে দিচ্ছি। ঐ যত নষ্টের গোড়া।

তখন কমলার সে ক্রোধ ও অভিমান দূর হইল, কমলা স্বামীর আদরে তখন একেবারে গলিয়া গেল। পরদিন

নগেন্দ্রনাথ মুক্তকেশীকে ডাকিয়া কহিলেন—"তোমার ক্ষিরো-মাসী আমার বাড়ীতে যেন আর না আসে। এলে অপমান করে, আমি তাকে তখনই দূর করে দেবো।"

মুক্তকেশী স্তম্ভিত হইয়া নগেন্দ্র নাথের এই কথা শুনিল! এরূপ উদ্ধতভাবে—এরূপ ভয়ঙ্কর কথা নগেন্দ্রনাথের মুখে সে আর কখন শোনে নাই! অনেকক্ষণ মুক্তকেশী গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল! তাহার পর, কি মনে ভাবিয়া একজন পরিচারিকার দ্বারা তৎক্ষণাৎ ক্ষিরোদাকে ডাকিয়া পাঠাইল। এদিকে নগেন্দ্রনাথের যে কথা—কার্য্যেও তাহাই ঘটিল। ক্ষিরোদাকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যের দ্বারা অপমান করিয়া, তাহাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ক্ষিরোদার মাথায় যেন একবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল! যে বাড়ীতে তাহার এত প্রভুত্ব, আজ হঠাৎ বিনা দোষে সে বাড়ী হইতে তাহাকে এরূপ অবমানিত হইয়া বহিষ্কৃত হইতে হইল। আর যে মুক্তকেশী তাহা অন্ত প্রাণ—সেই মুক্তকেশী তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া এই অপমানটা করাইল! ক্ষিরোদার এই আকস্মিক ঘটনা যেন প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! সে তখন তাহার আজন্ম অভ্যস্থ কোন্দল ও গালাগালি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল! আর মুক্তকেশী?—মুক্তকেশীও এই আকস্মিক ঘটনায় একবারে নির্ব্বাক্ ও নিষ্পন্দ! তাহারই সম্মুখে পৃথিবীর মধ্যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—সেই ক্ষিরোদা-সুন্দরীর আজ এই অপমান হইল, অথচ মুক্তকেশীর মুখে একটীও কথা নাই! মুক্তকেশী স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের মধ্যে তখন একটা মহাপ্রলয় হইতেছিল। মুক্ত-কেশী স্থিরনেত্রে এই ঘটনা অবলোকন করিল বটে, কিন্তু সেই

ছিন্ননেত্র হইতে তখন যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, মুক্তকেশী তখন আপনার টাকা-কড়ি, অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবানীয় দ্রব্যাদি লইয়া ক্ষিরোদা-সুন্দরীর গৃহে গিয়া উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

শিবপুরের বাজারের সন্নিকট একটি ক্ষুদ্র ময়দানে, আজ লোকে, লোকারণ্য। ভিতরে কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই; কিন্তু বহুলোকে বৃত্তাকারে যেন কাহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে—দূর হইতে দেখিলে, এইরূপ সকলেরই অনুমান হইতে পারে। কোনরূপ তামাসা হইতেছে মনে করিয়া, দলে দলে লোক সেই স্থানে আসিয়া জুটিতে লাগিল। এই লোকগণের মধ্যে বাজারের ফেরত লোকই অধিকাংশ। কাহার থলিতে, কাহারও বা গামছায় বাজার ঝুলিতেছে, অথচ সে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছে। কাহার কাঁকে, কাহার বা মাথায় বাজারের ধামা বা চুপড়ি শোভা পাইতেছে, অথচ সেও মাথায় মোট করিয়া—হাঁ করিয়া কি দেখিতেছে। আফিসের বাবু খড়াচূড়া আঁটিয়া তাড়াতাড়ি আফিসে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঐ স্থানে এত লোকের জনতা দেখিয়া, তিনিও অতি কষ্টে একবার মুহূর্ত্তের-জন্য উঁকিমারিয়া ভিতরের ঘটনা দেখিয়া লইতেছেন। বাজার লইয়া গেলে যে রন্ধন হইবে, সে কথা পর্য্যন্ত ঝি-চাকরদিগের মনে নাই, তাহারা রৌদ্রে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া যেন একেবারে তন্ময় হইয়া, কি দেখিতেছে। তাহারা যাহা দেখিতেছে, তাহা শুনিলে হয়

তো তোমরা হাসিবে; কিন্তু কি জানি কেন, তাহারা তাহা দেখিতে যেন একবারে আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছে!

তাহারা দেখিতেছিল কি জান? সেই ছিন্নমলিনবস্ত্র পরিহিত, ছিন্নমলিনপাগড়ী পরিশোভিত, ঝাড় ও বন্যলতাপুষ্প সুশোভিত খগা-পাগ্‌লাকে। সে পাগ্‌লা আজ সকলকে বড় আনন্দ দিতেছিল। সে কখন নাচিতেছিল, কখন বা গান গাহিতেছিল, কখন বা হাসিতেছিল, কখন বা কাঁদিতেছিল। পাগলের সে নর্ত্তন বড় হাস্যজনক, সে গান অতি মধুর, সে হাসি বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক, আর সে কান্না বড় মর্ম্মস্পর্শী! ইহাতে একপ্রকার নবরসের আবির্ভাব হইতেছিল, সেই জন্য এত লোক একপ্রকার জ্ঞানহারা হইয়া, তাহার এই অপূর্ব্ব পাগ্‌লামী দেখিতেছিল। পাগল যে কেবল এই নাচগান ও হাসিকান্নায় নিযুক্ত ছিল, তাহা নহে, সে মধ্যে মধ্যে একটা কবিতা আওড়াইতেছিল। নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে, হাসিতে হাসিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে পাগল এই অপূর্ব্ব কবিতা বলিতেছিল :—

"জাল জুয়াচুরি ভরা,
নয় কি তোমার ধরা?"

তাহার নাচ, গান, হাসি ও কান্না,—সকলেরই তাল হইতেছিল,—এই অপূর্ব্ব কবিতা! তবে কখন 'নয় কি তোমার ধরা' বলিতেছিল—কখন বা 'হয় কি তোমার ধরা' বলিতেছিল। লোকটা পাগল কি না, সেই জন্য সে যে 'নয়কে হয়' আর 'হয়কে নয়',—করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? আবার কেবল এই কবিতা নয় মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাও করিতেছিল। সে সময় সে যেন রাজনৈতিক উচ্চমঞ্চ হইতে বাঙ্গালী বাগ্মীবরের ন্যায়

উচ্চকণ্ঠে বলিতেছিল,—"ভাই সকল! এ পৃথিবীতে এখন আর কিছুই নাই—তুমি নাই—আমি নাই—মানুষ নাই—দেবতা নাই—আছে কেবল—জাল, জুয়াচুরী, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা!"

পাগলের এই অপূর্ব্ব কাণ্ডখারখানা দেখিয়া অনেকেই অনেক রকম অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। এক ব্যক্তি কহিল "এ পাগ্লাকে নিশ্চয়ই কেউ টাকা কড়ি ঠকিয়েছে, সেই টাকার শোকে পাগল হয়ে গেছে।"

অপর ব্যক্তি কহিল,—"তা হলে টাকা কড়ি নয়—বোধ হয়, কোন দলিল পত্র জাল করে, এর বিষয়-সম্পত্তি কেউ ঠকিয়েছে—সেই বিষয়ের শোকে লোকটা এমন পাগল হয়ে গেছে।"

অন্য এক ব্যক্তি কহিল—"যে কারণেই পাগল হউক, এ যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ছেলে, তা এর চেহারা দেখে, আর কথাবার্ত্তা শুনে বোধ হচ্ছে।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক একবারে ভেউ-ভেউ করে কাঁদিয়া কহিল,—"হায়, হায়, কোন্ হতভাগীর এমন সোনার রত্ন পাগল হয়ে গেছে রে!"

দর্শকগণের মধ্যে একজন ভদ্রলোক কহিলেন,—"একে যেন কোথায় দেখেছি—দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। বোধ হয় যেন, এর ভাল অবস্থায় কোথায় দেখেছি—এখন পাগল হয়ে বিশ্রী হয়ে গেছে বলে, আর চিন্‌তে পাচ্ছি না।"

অন্য একজন ভদ্রলোক কহিলেন—"আমাদের গ্রামেত আজ মাস আষ্টেক এ পাগলাকে দেখ্‌ছি, তার পূর্ব্বে ত কখন দেখি নাই। কোমরে পইতে আছে দেখতেছি—নিশ্চয় কোন ব্রাহ্মণের ছেলে হবে।"

অন্য এক ব্যক্তি কহিল—"সেটা নিশ্চয়। কারণ পাগল হলেও ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কারো ভাত খায় না।"

এই সময় অপর ব্যক্তি কহিল—"সে দিন নগেন্দ্র বাবুর বাড়ী পাড়ার সকলের নিমন্ত্রণ ছিল, তাই পাগল সেখানে সেদিন খেতে গিয়েছিল; কারণ যে দিন যে ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে দশ জন লোক খায়, পাগলকেও সেই দিন সেই বাড়ীতেই খেতে যেতে দেখি। ঠাকুর-দালানে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন হয়েছিল, আর পাগল, উঠানের একধারে একখানি পাত পেতে লুচির প্রত্যাশায় বসেছিল, এখন সময় খোদ নগেন বাবু এসে, পাগলের সে পাতাখানা পায়ে করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, ওকে সেখান থেকে তুলে, আর গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে দরোয়ানকে হুকুম দিলেন। পাগল হক, ব্রাহ্মণ ত বটে, তাঁর কি এ কাজ ভাল হয়েছে? আর ব্রাহ্মণ যদি নাই হয়, একটা লোক যখন খাবো আশা করে, পাত পেতে বসেছে, তাকে কি অমন করে তুলে দেওয়া উচিত?"

তাহার কথায় পোষকতা করিয়া অন্য একব্যক্তি কহিল—"ও-ভাই, বড় লোকে সব পারে, তুমি আমি এমন চামারের কাজ কখনই করতে পারি না।"

এমন সময় সেই স্থলে এক পাহারওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জনতা দেখিয়া, পাহারওয়ালার-গো একবারে অগ্নিশর্ম্মা হইল। রুল হস্তে সেই লোকদিগকে তাড়া করিয়া দৌড়িয়া গেল, সম্মুখে যে পড়িল, সেই দুই চারি-ঘা রুলের আঘাত খাইল। লাল-পাগড়ী দেখিয়া যে, যে দিকে পাইল, সে, সেই দিকে পলায়ন করিল। তখন পাগলও নাচিতে

নাচিতে একদিকে চলিল। আর উচ্চকণ্ঠে সেই নাচের তালে তালে আবৃত্তি করিতে লাগিল :—

"জাল জুয়াচুরি ভরা,
নয় কি তোমার ধরা?"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"নগেন্ চাটুর্য্যের সর্ব্বনাশ আমি করব করব—ওর, কি উপায় আছে আমায় বল।" এক মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা উত্তেজিতস্বরে উপরোক্ত কথা কয়েকটি বলিয়া সম্মুখস্থিত এক ব্যক্তির প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। সে ব্যক্তি তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"ঠাকুর-ঝি, এর উপায় আছে—খুব ভাল রকম উপায়ই আছে—তোমার বাপের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি যদি আমি তোমায় দিতে না পারি, তবে আমি পইতে ফেলে দেবো—আমার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নয়!"

ঠাকুর-ঝি, তখন বড় আশায় বুক বাঁধিয়া আগ্রহের সহিত কহিল—"তবে কি উপায় আছে—আমায় শিগ্‌গীর বল।"

ঠাকুর-ঝি অন্য কেহ নহে, আমাদের সেই মুক্তকেশী। আর মুক্তকেশী এখন যাহার সহিত কথা কহিতেছে—এ ব্যক্তি ক্ষিরোদার জামাতা, নাম নীলমণি গঙ্গোপাধ্যায়। নীলমণি তখন উত্তর করিল,—"ঠাকুর-ঝি পারবে কি?"

মুক্তকেশী আপনার মুখমণ্ডল হইতে উন্মুক্তকেশগুচ্ছ সরাইয়া পুনরায় উত্তেজিত ভাবে কহিল—"যদি, আমি আমার বাপের বিষয় পাই, তবে এমন কি কাজ আছে, যা আমি পারি না?"

নীলমণি। অন্য কাজ কিছুই নয়, তুমি মোকর্দ্দমা করলেই, তোমার বাপের সমস্ত বিষয়ই তোমার হবে।

মুক্ত। বাবা যে উইল করে গেছেন।

নীল। সে উইল আমি ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো। মেয়ে জীবিত থাকতে ভাগ্নে কি কখন বিষয় পায়?

অদূরে ক্ষিরোদাসুন্দরী বসিয়া গরুর খড় কাটিতেছিল, ক্ষিরোদা এইবার সকরুণস্বরে কহিল—"তোর কষ্ট আর দেখ্‌তে পারি না মা, তুই আমার নীলমণির কথা শোন—তোর ভাল হবে—সব দুঃখ ঘুচে যাবে। নগেন চাটুর্য্যের এত বড় আস্পর্দ্ধা! বাছা আমার রাগ করে এসেছে—তাকে একবার ডাক্‌লেও না! উপরে ভগবান আছেন, এখনও রাতদিন হচ্ছে, তার এ অহঙ্কার চূর্ণ হবে—হবে—হবে!"

ক্ষিরোদার উৎসাহে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তখন মুক্তকেশী কহিল,—"আচ্ছা, আমি মোকর্দ্দমাই করবো—এখন মোকর্দ্দমা করতে হলে, আমায় কি করতে হবে বল।"

ক্ষিরোদা। তোমায় কিছুই করতে হবে না মা, আমার নীলমণিই তোমার হয়ে সব করবে। ওকে জজেরা পর্য্যন্ত ভালবাসে। তোমার মতন কত লোকের বিষয় উদ্ধার করে দিয়েছে। বাবা আমার—তোমার জন্য কত দুঃখই, সে দিন আমার কাছে করলে! ঐ তোমার সব করে-কর্ম্মে দেবে।

নীল। তোমায় কেবল কিছু টাকা খরচ করতে হবে।

মুক্তকেশী তখন আগ্রহের সহিত কহিল,—"কত টাকা?"

নীল। অন্যের যে টাকা, এ মোকর্দ্দমায় খরচ হবে, আমি তার অর্দ্ধেক টাকায়, তোমার এ মোকর্দ্দমা জিতে দিতে পারবো।

তবে অনেক টাকার বিষয় বলেই যা বলো। তা তোমার বেশী ব্যয় হবে না, এই বড় জোর দু-তিন হাজার টাকা।

ক্ষিরোদা। নীলমণি আমার উকিলের বাড়ী চাকরী করে, কত জজ ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ওর আলাপ, তোমার টাকা বেশী খরচ হবে কেন মা? আমার নীলমণি বলে যে, তোমার টাকা ওর নিজের গায়ের রক্ত। সে দিন তুমি একটি টাকা আমার নাতীর হাতে দিয়েছিলে বলে, নীলমণির তাতে রাগ কত! আমাকেই সেজন্য দশ কথা শুনিয়ে দিলে।

নীল। আমার এক ভয় হয় যে, পাছে পাড়ার লোকে কিছু বলে।

ক্ষিরোদা তখন খড় কাটা বন্ধ করিয়া ক্রোধভরে উন্মত্তবেগে নীলমণির নিকট আসিয়া হাত নাড়িয়া কহিল—"তুমি আর পাড়ার লোকের কথা তুলো না বাপু। পাড়ার লোকের মুখে আগুন, তাদের সর্ব্বনাশ হক—তাদের মড়া মরুক—তাদের বংশে বাতি দিতে যেন কেউ না থাকে—আমার প্রসন্ন দাদা যখন মরে গেছেন, তখন এ পাড়ায় কি আর লোক আছে বাবা? আহা! বাছাকে আমার এক প্রকার বল্‌তে গেলে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—এ পাড়ায় লোক থাক্‌লে, তার বিহিত কি কেউ কর্‌তো না? অন্য পাড়া হলে, ঐ নগেন্ চাটুর্য্যেকে এক ঘরে কর্‌তো যে—তার মুখে চুন-কালী ঢেলে দিত যে। যার বাপের বিষয়—সে কি না ভেসে এল! আর একটা মেগের-ভেড়া উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লো! এত অধর্ম্ম কখনই সবে না। আমি যদি বামুনের মেয়ে হই, তবে এর প্রতিফল তাকে পেতে হবেই হবে।"

মুক্ত। গাঙ্গুলী মশাই, তোমার পাড়ার লোকের ভয় কর্‌লে চল্‌বে না, তোমায় এ মোকর্দ্দমায় লাগ্‌তেই হবে। আমায় যদি নিজে জজের কাছে দাঁড়াতে হয়, আমি তাও দাঁড়াব—আমার যথা সর্ব্বস্ব যদি এ মোকর্দ্দমায় খরচ কর্‌তে হয়, আমি তাও কর্‌ব।

নীলমণি তখন জিহ্বা কাটিয়া কহিল—"রাধা মাধব! তোমায় আদালতে দাঁড়াতে হবে কেন? তুমি কত বড়লোকের মেয়ে, তা শুন্‌লে, জজ তোমাকে আদালতে হাজির কর্‌তে আদৌ চাইবে না। তবে মোকর্দ্দমা কর্‌তে হলে—টাকা খরচ তোমায় করতে হবে। আর যদি মোকর্দ্দমা করাই মত হয়, তবে দেরী করলে আর চল্‌বে না। যত দেরী করবে, ততই মোকর্দ্দমার পক্ষে হানি হবে। মোকর্দ্দমা রুজু করতে আর তোমার বেশী টাকার আবশ্যক হবে না। এখন হাজার টাকা পেলে, আজই আমি মোকর্দ্দমা রুজু করে দিতে পারি।"

মুক্তাকেশী একবার নীলমণির মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল—"হাজার টাকা দিলে, যদি আজই এ মোকর্দ্দমা রুজু হয়, তবে এখনই আমি তোমায় হাজার টাকা এনে দিচ্ছি।"

কথাবার্ত্তাটা ক্ষিরোদার বাহির বাড়ীতে বসিয়া হইতেছিল, উপরোক্ত কথা কয়েকটি বলিয়াই, মুক্তকেশী দ্রুতপদে তাহার অন্দরের মধ্যে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই নোটে ও নগদে হাজার টাকা আনিয়া নীলমণিকে দিল। নীলমণি সে সমস্ত টাকা পুনরায় গণিয়া কোঁচার খুঁটে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে পর, মুক্তকেশী কহিল,—"দেখ ভাই, আমায় যেন মজিও না—আমি তা হলে তোমার সুমুখে মাথা খুঁড়ে মরব। তুমি স্ত্রী-হত্যার পাতক হবে।"

নীলমণি সে কথা শুনিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"সে কি কথা বল ঠাকুর-ঝি! আমি কি সে ধারার লোক?"

"জাল জুয়াচুরি ভরা,
এই ত তোমার ধারা!"

উপরোক্ত শ্লোকটি বলিতে বলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই খগা-পাগ্লা সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল! হঠাৎ সে যে ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইল, তাহাতে উপস্থিত তিন জনেই মনে করিল যে, পাগল বুঝি সেই স্থানের মাটী ফুঁড়িয়া উঠিল! এই আকস্মিক উপস্থিতিতে তিন জনেই বিস্ময় ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া পড়িল! কাহার মুখে আর কথা নাই। কিছুক্ষণ পরে ক্ষিরোদা এক গাছি ঝাঁটা কুড়াইয়া লইয়া কহিল—"তবে রে পোড়ার মুখে! তোর্ পাগ্‌লামী বার্ করছি দাঁড়া!" কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে ক্ষীরোদা পাগলকে মারিতে ধাবিত হইল। গতিক ভাল নয় দেখিয়া, পাগলও সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইল।

একোনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বৈঠকখানাটি একটি প্রকাণ্ড গৃহ। সে গৃহের পেণ্টিং-করা দেয়ালে, নানা রকমের দেশী ও বিলাতি সুন্দর ছবি সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বেলোয়ারী কলমবিশিষ্ট দেয়াল-গিরি সকল শোভা পাইতেছে। গৃহটি যত বড় লম্বা, তত বড় একখানি সুন্দর বেলোয়ারীর টানা-পাখা মাথার উপর ঝুলিতেছে। পাঁচটি সুন্দর ঝাড়ও সেই পাখার উপর শোভা পাইতেছিল, তাহার মধ্যে মধ্যস্থলের ঝাড়টি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—পঞ্চাশটি শাখাবিশিষ্ট। হর্ম্মতলে সুন্দর গদিবিশিষ্ট ফরাসের বিছানা, তাহার উপর সারি সারি অতি শুভ্র তাকিয়া সকল সাজান রহিয়াছে। বৈঠকখানার আড়ের দিকের দুইটি দেয়ালে দুইখানা প্রকাণ্ড আয়না। প্রত্যেক আয়নার দুইপার্শ্বে দুইখানি মারবেলের টেবিল। সে টেবিলের উপর কাঁচ ও হস্তি-দন্ত নির্ম্মিত নানাপ্রকার সুন্দর সৌখীন দ্রব্য সকল শিল্পকরের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। সুতরাং আমরা আবার বলি—নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানার কি অপূর্ব্ব শোভা!

এই বৈঠকখানার মধ্যস্থলে আজ পারিষদ পরিবেষ্টিত হইয়া নগেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট। পারিষদগণের মধ্যে একটা গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছিল, কিন্তু সে বিষয়টা গুরুতর বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বিবেচনা করিতেছিলেন না। সেই কারণ, তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"তোম্‌রা কেন এ কথা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কর্‌ছ? আমি এর জন্য কিছুই ভীত নই।"

নগেন্দ্রনাথের এই কথায় একজন পারিষদ কহিল—"আপ্‌নি এর জন্য কিসে ভয় পাবেন? কিন্তু নালমণির কি আক্কেল্—আম্‌রা সেই কথাই বল্‌ছি।"

অন্য একজন পারিষদ কহিল—"তার ত ব্যবসাই ঐ। একটা মেয়ে-মানুষকে যে মজাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সে এই রকম করে, কত ভদ্রলোককেও মজিয়েছে।"

প্রথম পারিষদ। বেটার আস্পর্দ্ধা দেখেছ! কর্ত্তার উইলখানা বুঝি একবারে উড়ে যাবে?

নগেন্দ্র। উইলের কথাই বা তোমরা তোল কেন? উইল যদি মামা না করে যেতেন, তা'হলেও কি মেয়েতে বিষয় পেত না কি? উইল না থাক্‌লে, আমি একলা সব পেতুম না, সুরেশচন্দ্রও অর্দ্ধেক পেত। আমাদের শাস্ত্রমতে সন্তানহীন বিধবা পিতার সম্পত্তি হলেও, উত্তরাধিকারিণী হয় না।

দ্বিতীয় পারিষদ। তবেই ত এ রকম জেনে শুনে, আপনার শত্রুতা কিরূপে করে?

নগেন্দ্র। আমার পক্ষে এ শত্রুতা করা নয়—বরং মিত্রতাই হচ্ছে। দিদির হাতে কতকগুলা নগদ টাকা পড়ায়, তার মেজাজ বড় গরম হয়ে গেছে। দেখ না—এই মোকর্দ্দমায় তার

যথাসর্ব্বস্ব যাবে—তাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে; আর তা হলেই, আমারও উপকার করা হবে।

এই সময় অন্য এক পারিষদ কহিল—"তা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু এই যে টাকাগুলো পাঁচভূতে খাবে—সে টাকাও ত আপ্নারই। আর এ মোকর্দ্দমা চল্‌লে, আপনারও ত ঘরের টাকা খরচ হবে। যে দিক্ দিয়াই যাক, আপ্নারই ক্ষতি। সেই জন্যে আমি বল্‌ছি—আপনার দিদিকে ঘরে নিয়ে আসুন, সব গোলযোগ মিটে যাক্।"

নগেন্দ্র। আমি ত তাঁকে তাড়িয়ে দিই নাই—আর তিনি এলেও আমার কোন আপত্তি নাই। তবে তিনি যদি না আসেন, আমি কি কাব্?

প্রথম পারি। তা'ত বটেই। আপ্নি অত নরম হতে গেলে একবারে পেয়ে বস্‌বে। তাঁর কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার। এ মোকর্দ্দমা চালাতেই হবে—আপ্নার দু-চার হাজার টাকা গেলে, তাতে তার কি হবে?

নগেন্দ্র। মোকর্দ্দমা আর কি চল্‌বে? যার কোন স্বত্বই নাই, সে কি করে মোকর্দ্দমা কর্‌বে?

এমন সময় আমাদের জানকীনাথ হাসিতে হাসিতে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তিতে সেই বৈঠকখানায় আসিয়া কহিল—"চাটুর্য্যে মশাই, তোমায় কম্‌লী ডাক্‌ছে, শীগগির এসো—না এলে কম্‌লীকে বলে দিয়ে, তোমায় খুব মার খাওয়াবো।"

নগেন্দ্রনাথ এইরূপ সম্ভাষণে বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"ভূত আর কি! আজও কথা কইতে শিখ্‌লি না? আমি যাচ্ছি—তুই বাড়ীর ভিতরে যা।"

জানকীনাথ নগেন্দ্রকে শাসাইয়া কহিল—"আচ্ছা, আমায় ভূত বলেছ—আমি কমলীকে বলে দেবো এখন। আর আমি যাব কেন—আমায় যে তোমায় ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।"

নগেন্দ্র। কেন? এত তাড়াতাড়ি কিসের?

জানকী। বল্‌বো—হিঃ হিঃ হিঃ।

জানকীনাথের সে বিকট হাস্যে নগেন্দ্রনাথ বড়ই বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"আঃ মলো—বল্‌বা কি দরকার?"

জানকী। জানি না নাকি?—আজ থিয়েটারে যেতে হবে। গাড়ী করে যাবো—খুব নাচ-গান শুন্‌বো—তুমি শীগ্‌গির এসো না?

নগেন্দ্র। থিয়েটারে যে যাবি—আজ কি বার বল্ দেখি।

জানকী। বল্‌বো-বল্‌বো—জানি না নাকি? আচ্ছা, বল্‌তে পার্‌লে; আমায় একটা টাকা দিতে হবে কিন্তু।

নগেন্দ্র। তা আর দেবো না? তুমি এত বড় একটা কথা বল্‌বে—এর জন্য তোমায় ভালরূপ পুরস্কার দেওয়া নিশ্চয়ই আবশ্যক।

এই সময় প্রথম পারিষদ কহিল—"কই জানকী বাবু, আজ কি বার বলো না—বাবুত তোমায় এক টাকা বক্‌সিস্ করবেন বল্‌ছেন।"

জানকী। আচ্ছা, বল্‌ছি—বল্‌ছি। দৌড়ে গিয়ে কমলীকে জিজ্ঞেস্ করে আস্‌বো।

১ম পারি। তা হলে তুমি টাকা বক্‌সিস্ পাবে কেন?

জানকী। আচ্ছা, কাল কি বার গেছে বল দেখি।

১ম পারি। কাল বুধবার গেছে।

জানকীনাথ তখন মুখভঙ্গিমার সহিত দন্তপাটি বাহির করিয়া কহিল—"জানি না নাকি?—আমায় কেউ ঠকাতে পার্বে না—আজ শনিবার।"

উপস্থিত সকলে তখন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। জানকীনাথ তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিল—"শনিবার না হলে, থিয়েটার দেখ্তে যাবো কি করে—আমি জানি না নাকি? শনিবারেই ত থিয়েটার হয়।"

তখন নগেন্দ্রনাথ প্রথম পারিষদকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"ওহে প্রকাশ বাবু, আমাদের জানকীনাথের একটি বিয়ে দিতে পার?"

প্রকাশ সে কি মহাশয়? এমন সোনার চাঁদের আর বিয়ে দিতে পার্বো না?

জানকীনাথ এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, এই বার তাড়াতাড়ি গিয়া প্রকাশচন্দ্রের গা-ঘেঁসিয়া বসিল এবং তাহার হাত দুইটি লইয়া টিপিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ কহিলেন—"আর দুই একটা ঐ রকম কথা বল্লেই, এখনই তোমার পা টিপ্তে আরম্ভ করে দেবে। জানকীর বিয়েটা আমায় দিতেই হচ্ছে। তুমি ভাই, শীগ্গির একটা সম্বন্ধ স্থির করে ফেলো।"

প্রকাশ। এমন সম্বন্ধী আপনার আর কটি আছে? এরা কয় সহোদর?

নগেন্দ্র। ঐ—সবে ধন নীলমণি।

জানকীনাথ তখন সে উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কহিল—"কেন—আম্রা তিন সহোদর।"

নগেন্দ্র। আ—মর্, বিয়ের নামে যে সব ভুলে যাচ্ছিস্। তুই আবার তিন সহোদর পেলি কোথায়?

জানকী। কেন—আমি, মা আর পিসী মা—আমরা তিন সহোদর হলুম না?

জানকীনাথের এই উত্তরে সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। জানকীনাথ কিন্তু কোনরূপ অপ্রস্তুতের ভাব না দেখাইয়া কহিল—"কেন? দিদি আর কমলী ত বিয়ে হয়ে গেছে—তারা এখনও সহোদর হবে না কি?"

প্রকাশ। যাক্ ও-কথা—এখন বিয়ের কথাটাই হক। যদি একটু বড় মেয়ে পছন্দ হয়—তবে আমি আজ এইখানে বসেই, একটা সম্বন্ধ স্থির করতে পারি।

নগেন্দ্র। কিরে—কি বলিস্?

জানকীনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল—"পিসী-মা বলেছে—বড় মেয়েই ভাল।"

প্রকাশ। সে ক'নেকে জানকী বাবুও দেখেছে। আমি বলি—শ্যাম কামারের মা—মাগী বিয়ে বিয়ে করে বেড়ায়, তারই সঙ্গে জানকী বাবুর বিয়ে হক।

২য় পারি। সেই পাগ্‌লীটের সঙ্গে!

৩য় পারি। আবার তার পায়ে একটা গোদও আছে।

জানকীনাথ তখন দন্তপাটি বাহির করিয়া কহিল—"তা হক।"

নগেন্দ্র। তা বেশ হবে—ক'নের বয়সও কিছু বেশী হয় নাই। ঘেটের কোলে—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে—এই সবে ষাট বৎসরে পড়েছে। দাঁত যে নাই, তা বাঁধিয়ে দিলেই চলে যাবে। মাথার

চুল যে শাদা হয়ে গেছে—তাতেও কলপ দিলেই চল্‌বে। কিরে শালা? ক'নে পছন্দ হয়েছে ত?

জানকীনাথ একবারে আহ্লাদে আট খানা হইয়া কহিল—"খুব পছন্দ হয়েছে। কবে বিয়ে হবে চাটুর্য্যে মশাই?"

চাটুর্য্যে মহাশয় কি বলিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় গুরুচরণ চাকর আসিয়া কহিল—"বাবু, আপ্‌নাকে একবার বাড়ীর ভিতর যেতে হবে।"

নগেন্দ্রনাথ এখন আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, সকলকে বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গেলেন। জানকীনাথও ভাবী বিবাহের আনন্দে নাচিতে নাচিতে নগেন্দ্রনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শারিরীক ব্যাধি যেরূপ শরীরকে জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া ফেলে, মানসিক ব্যাধিও সেইরূপ শরীরকে জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া থাকে। তবে শারিরীক ব্যাধি অপেক্ষা মানসিক ব্যাধিই অধিক যন্ত্রণা-দায়ক, কারণ শারীরিক ব্যাধি লোকলোচনের সম্মুখে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলে, আর মানসিক ব্যাধি, লোকের অগোচরে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া থাকে। শারিরীক ব্যাধির চিকিৎসা চলে, সেই চিকিৎসায় রোগেরও উপশম হয়, কিন্তু মানসিক ব্যাধির সেরূপ কোন চিকিৎসাই নাই! সেই জন্য ম্যাক্‌বেথ এই মানসিক ব্যাধির যন্ত্রণায় অস্থির, হইয়া এক দিন এক চিকিৎসককে বলিয়াছিলেন :—

"Canst thou not minister to a mind diseased,
Pluck form the memory a rooted sorrow?
Raze out the written troubles of the brain,
And, with some sweet oblivious anti-dote
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart."

কিন্তু চিকিৎসকের ইহা সাধ্যাতীত। চিকিৎসক শারীরিক

ব্যাধির চিকিৎসায় সুনিপুণ হইলেও, মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসার কোন ঔষধই জানেন না, মানসিক ব্যাধির কোন শান্তিই করিতে পারেন না। সেই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানসিক ব্যাধিই অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

ডাক্তার অভয়াচরণ বাবু অন্যের শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন বটে, কিন্তু নিজের মানসিক ব্যাধির কোন চিকিৎসাই করিতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে এই মানসিক ব্যাধির যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। মনের সহিত শরীরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই জন্য এই মানসিক ব্যাধির দরুণ ক্রমে তাঁহার শরীরও বড় জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িল। মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই—শরীরেও কিছুমাত্র বল নাই। এ অবস্থায়, তিনি চিকিৎসা ব্যবসাই বা করিবেন কিরূপে? কোন কার্য্যেই এখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ডাক্তার বাবুরই বাড়ী পাড়ার সকলের একটা প্রধান আড্ডা স্বরূপ ছিল, কিন্তু এখন এই মানসিক ব্যাধির যন্ত্রণায় ডাক্তার বাবুর স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; তিনি এখন আর এরূপ লোকজন দেখিতে ভালবাসিতেন না। সেই জন্য পূর্ব্বের ন্যায় কেহ আর সে বাড়ীতে একত্রিত হইত না। ডাক্তার বাবুর বৈঠকখানা দিবারাত্র আর সেরূপ কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল না। চাকরগণ তামাক সাজিতে সাজিতে আর সেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইত না। স্নানের সময় সে একত্রে তৈলমর্দ্দনের ব্যাপারও আর ছিল না। ডাক্তার বাবুর স্বভাবের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে, সকলেই বিস্মিত হইল! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইয়াছিল—আমাদের সৌদামিনী। সৌদামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে,

স্বামীর মনের উপর যেন কি একটা ভয়ঙ্কর বোঝা ঝুলিতেছে! তখন সে বোঝা দূর করিতে সৌদামিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। স্বামীর আর্থিক অবস্থার বিষয় সৌদামিনীর অবিদিত ছিল না, সেই জন্য সৌদামিনী স্থির করিল, অতঃপর সাংসারিক ব্যয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া চলিবে—নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন কোন বিষয়ে এক কপর্দ্দকও আর ব্যয় করিবে না। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও সৌদামিনী স্বামীর সে মনোকষ্ট দূর করিতে পারিল না। অভয়াচরণ সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া কি চিন্তা করিতেন, রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, পূর্ব্বের ন্যায় কাহার সহিত কথাবার্ত্তাও বড় কহিতেন না। নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় পড়িলে, তবে তিনি চিকিৎসা-কার্য্যে বাহির হইতেন। নিজের উপার্জ্জনের দিকেও তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই মনোযোগ ছিল না! সৌদামিনী এই সকল দেখিয়া একদিন স্বামীকে ধরিয়া বলিল—"তোমার কি হয়েছে, আজ আমায় বল্‌তেই হবে।"

অভয়াচরণ সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"আমার কি আবার হবে—কিছুই হয় নাই।"

কিন্তু যে ভাবে তিনি উপরোক্ত কথা কয়েকটি কহিলেন, তাহা দেখিয়া—সৌদামিনীর-প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সৌদামিনী তখন সকরুণ-স্বরে কহিল—"আমার কাছেও গোপন করছ? আমি কি কিছুই বুঝতে পারি না? একবার ঐ আর্সী খানার সুমুখে দাঁড়িয়ে, নিজের চেহারা-খানা দেখ দেখি। তোমায় এখন দেখ্‌লে যে আমার প্রাণ ফেটে যায়। তোমার সে দেহ নাই, সে রূপ নাই, সে স্বভাব চরিত্রের পর্য্যন্ত

পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি কার কাছে লুকাচ্ছ? আমায় তোমার মনের কথা বল্‌বে না?”

বলিতে বলিতে শিশিরাভিষিক্ত বৃক্ষপত্র সকালে যেরূপ সেই পত্র হইতে ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া শিশির-বিন্দুর পতন হইয়া থাকে, সৌদামিনীর নেত্রদ্বয় হইতে সেইরূপ ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অশ্রুপতন হইতে লাগিল। সে অশ্রুপতন স্বচক্ষে দেখিয়াও অভয়াচরণ কোন কথা কহিলেন না, অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণের পর, এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন— “সৌদামিনী, সত্যই আমার একটা মনের কথা তোমার কাছে আমি গোপন রেখেছি। সে কথা তোমার কাছে প্রকাশ কর্‌বার নয়—সেই জন্যই গোপন করেছি।”

সৌদা। তোমার মনের ভিতর এমন কি কথা থাক্‌তে পারে, যে কথা তুমি আমার কাছে প্রকাশ কর্‌তে পার না?

অভয়া। সে একটা সেইরূপই ভয়ঙ্কর কথা। সৌদামিনী, তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমার কাছে সে কথা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বো না।

সৌদা। তোমার কি বেশী দেনা-পত্র হয়েছে? আমি সে দেনার কথা শুন্‌লে মনে কষ্ট পাবো বলেই কি—তুমি আমায় সে কথা বল্‌ছো না? তবে তুমি আমায় আজও চিন্‌তে পার নাই। আমি তোমার ঢের সুখভোগ করেছি, আজ যদি তোমার সঙ্গে আমায় গাছতলায় দাঁড়াতে হয়, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাতেও প্রস্তুত। আমার সব গহনা—আমার বাছাধনের সব গহনা বেচ্‌লেও কি তোমার সে দেনা পরিশোধ হয় না?

অভয়া। না—তা হয় না।

সৌদা। আমাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বাড়ী ঘর বেচ্‌লেও কি সে দেনা পরিশোধ হয় না?

অভয়া। না সৌদামিনী তা হয় না—এ দেনা টাকায় পরিশোধ হবার নয়।

সৌদামিনী বিস্মিত হইয়া কহিল—"সে কি! তোমার কথাত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।"

অভয়া। আমার দেনার জন্য আমার এ মনের অবস্থা নয়—দেনা পরিশোধ করেই আমার এ মনের অবস্থা করেছে!

সৌদা। তবে সে কথা আমায় খুলে বল। তুমি আমার প্রাণে আর কষ্ট দিও না—আর সে কথা গোপন রেখ না—বল, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় শীগ্‌গির বল।

অভয়া। সৌদামিনী, আমায় ক্ষমা কর, আমি প্রাণ থাক্‌তে সে কথা তোমায় বল্‌তে পারবো না।

সৌদা। সেকি কথা তুমি বল্‌ছো? সে কথা যতই ভয়ঙ্কর হক, আমায় তুমি বল—আমার তাতে কোন কষ্টই হবে না।

অভয়া। আচ্ছা বল্‌বো—কেবল তোমায় কেন—একদিন সকলকে সে কথা বল্‌বো।

সৌদা। কবে বল্‌বে?

অভয়াচরণ কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তাহার পর এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আমি যে দিন মর্‌বো—সেই দিন সে কথা সকলকে বলে, তবে মর্‌বো।"

অকস্মাৎ কাহারো সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে, সে ব্যক্তি যেরূপ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, অভয়াচরণের এই কথায় সৌদামিনী সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন অভিমান ও দুঃখে—সৌদামি-

নীর প্রাণ যেন বাহির হইবার উপক্রম হইল। সৌদামিনী সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তখন অন্য গৃহে গেল এবং সে গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। গৃহের মধ্যে একটা শয্যাও ছিল, সেই শয্যায় পড়িয়া সৌদামিনী কিছুক্ষণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তাহার পর, কাঁদিতে আরম্ভ করিল—অজস্র চক্ষুর জলে বিছানা বালিশ সমস্তই ভিজিয়া গেল। আর অন্য গৃহে অভয়াচরণ একাকী নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দভাবে অগাধ চিন্তাসাগরে ডুবিয়া রহিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী-গৃহে না যাওয়ায়, নির্ম্মলকুমারীর পিত্রালয়ে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার সীমা ছিল না। যে পিতা 'মা নির্ম্মল' বলিতে অজ্ঞান হইতেন, সে পিতা এখন নির্ম্মলের নাম শুনিলে, ঘৃণায় ও লজ্জায় বিরক্ত হইয়া অন্দর হইতে চলিয়া যাইতেন। তাঁহার কন্যা সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন—"আমার সে মেয়ের নির্ম্মল নাই, মরিয়া গিয়াছে; এখন যে নির্ম্মলকে দেখ, সে তার প্রেতাত্মা!" ক্ষোভে, দুঃখে ও লোক-নিন্দাভয়ে ব্রাহ্মণ কাশীবাসী হইবার জন্য এখন প্রস্তুত হইতেছেন। নির্ম্মলের জননী এখনও কন্যাকে ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু কন্যার এরূপ ব্যবহার যখন অসহ্য হইত, তখন তিনি অজস্র গালি দিতে ছাড়িতেন না। নির্ম্মলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও নির্ম্মলকে পূর্ব্বের ন্যায় আর স্নেহ করিতেন না, নির্ম্মল তাহার একবারেই চক্ষুশূল—মুখে কোন কথা বলিতেন না বটে, কিন্তু হঠাৎ নির্ম্মল তাহার সম্মুখে পড়িলে, তিনি মুখ ফিরাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন। ফলতঃ আর কেহ নির্ম্মলকে ভালবাসিত না, তাহার জন্য সমাজে মুখ দেখাইতে পরিবারস্থ সকলেরই যেন কষ্টবোধ হইত। এইরূপ অনাদরে, অযত্নে, লাঞ্ছনায়, গঞ্জনায় নির্ম্মলের

দুঃখময় জীবন পিত্রালয়েই অতিবাহিত হইতে লাগিল। নির্ম্মলের মুখে কিন্তু একটিও কথা ছিল না, সে সর্ব্বদাই নীরবে ও নির্জ্জনে অতি দীন ও হীনভাবে সকলই সহ্য করিয়া থাকিত; সহস্র তিরস্কারেও সে সহ্যগুণের ব্যতিক্রম হইত না।

একদিন প্রাতে নির্ম্মলকুমারী একটি ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে এইরূপ একাকী বসিয়া রহিয়াছে, এমন সময় তাহার জননী সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—"নির্ম্মল, এখনও তুই আমার কথা শোন্—এখনও শ্বশুরবাড়ী যা। সতীন তোর অদৃষ্টে ছিল, তাই হয়েছে— কুলীনের ঘরের মেয়ে সতীনকে ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন মা? আর ও-সতীন ত তোর নিজের দোষেই হয়েছে। কি বলিস্?—আমার কথার উত্তর দে।"

নির্ম্মল নীরবে জননীর এই সকল কথা শুনিতেছিল, সে কথার কোন উত্তর দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু জননী বারংবার উত্তরের জন্য জেদ করায়, বলিতে বাধ্য হইল—"কি উত্তর আর দেবো মা? আমার সেই একই উত্তর, নূতন উত্তর কিছুই দিতে পারবো না।"

জননী এ উত্তরে বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আমি তোর মা হয়ে, এত করে বল্‌ছি—তবু আমার কথা শুন্‌বি না?"

নির্ম্মল। শোন্‌বার কথা হলে, তখনই শুন্‌তাম মা।

জননী। আমি তোকে কেবল শ্বশুর-বাড়ী যেতে বল্‌ছি, এ কি শোন্‌বার কথা নয়?

নির্ম্মল। শ্বশুরবাড়ী কার কাছে যাব মা?

জননী। কেন তোর সোয়ামীর কাছে যাবি।

নির্ম্মল। শ্বশুরবাড়ীতে আমার স্বামী ত নাই।

জননী। তবে তোর স্বোয়ামী কোথায়।

নির্ম্মল। আমার স্বামী বিদেশে।

কন্যার এই কথায় জননীর তখন ক্রোধের সীমা রহিল না, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—"পোড়ারমুখী, এখনও তোর সেই কথা! আচ্ছা, তবে তুইও সেই বিদেশে যা—আমার বাড়ী থেকে দূর-হ—দূর-হ।"

নির্ম্মল তখন অতি ধীর ভাবে কহিল—"দূর শীগ্‌গিরই হবো মা। সেই বিদেশেই যাবো মা—আমি যে বিদেশে যাবো, সেখান থেকে আর ফিরে আস্‌বো না, আর তোমাদের যন্ত্রণা দেবো না মা।"

কন্যার মুখে সকরুণ-কণ্ঠে এই কথা শুনিয়া জননীর ক্রোধের কতকটা হ্রাস হইল, তখন তিনিও সকরুণস্বরে কহিলেন—"তোর জন্যে যে আমাদের মুখ দেখান ভার হয়েছে। তোর জন্যে আমি গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত যে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।"

নির্ম্মল। কেন গঙ্গাস্নান যাওয়া বন্ধ করেছ মা?

জননী। তোর নিন্দে শুনতে শুনতে যে কান ঝালা পালা হয়ে যায়।

নির্ম্মল তখন মনে মনে ভাবিল—"গঙ্গা-স্নান! গঙ্গাস্নান! সে ত বেশ।" প্রকাশ্যে কহিল—"তবে এখনই আমি গঙ্গাস্নানে যাবো।"

জননী। লোকের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে যাবি? তুই লাগার কাজ করেছিস্, তাই তো লোকে বলে।

"আমি তোমার তেমন ঝগড়াটে মেয়ে নই।"—এই কথা

বলিয়া নির্ম্মলকুমারী গঙ্গাস্নানের উদ্যোগ আরম্ভ করিল। শিবপুরের মেয়েরা পদব্রজেই গঙ্গাস্নানে যায়; নির্ম্মল এখন পদব্রজেই চলিল। তাহাকে একাকী যাইতে দেখিয়া জননী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"তুই একলা যাবি নাকি?"

নির্ম্মল তখন একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে লইল। তাহা দেখিয়া জননী কহিলেন—"এখন গঙ্গার জোয়ার হয়েছে—জোয়ারের জলে নাইলে তোর অসুখ করবে না ত?"

"তোমার আশীর্ব্বাদে কোন অসুখই করবে না মা।"—বলিতে বলিতে নির্ম্মল জননীর চরণে প্রণাম করিল। "মা গঙ্গা যেন তোকে সুবুদ্ধি দেন"—বলিয়া জননী সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। গোপনে দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া নির্ম্মলকুমারী ধীরে ধীরে গঙ্গাস্নানে বাহির হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাজে-শিবপুরের গঙ্গাস্নানের ঘাটের কি অপূর্ব্ব শোভা! পাশাপাশি দুইটি ঘাট, একটি স্ত্রীলোকদিগের স্নানের জন্য আর অপরটি পুরুষদিগের জন্য। আজ প্রাতে স্ত্রীলোকদিগের ঘাটে অনেকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল। কেহ গাত্রমার্জ্জন, কেহ বা পূজা-আহ্নিকে নিযুক্ত। গঙ্গার কূলে কূলে জল, তীরস্থ চড়া আজ সেই জলে প্লাবিত। চড়াস্থিত নালা, ডোবা প্রভৃতি সব এখন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চড়ার উপর সারি সারি রজ্জুবদ্ধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেগুণ কাষ্ঠ সকল ভাসিতেছে। অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া, জোয়ারের টানে তীরের ন্যায় নৌকা সকল উত্তর মুখে চলিয়াছে। এখন দাঁড়ীগণকে আর দাঁড় টানিতে হয় না, সুতরাং তাহারা মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে। সেই পরিপূর্ণ গঙ্গা তোলপাড় করিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একখানা ষ্টীমার মহাদম্ভে চলিয়াছে। সে দম্ভের তোড়ে পড়িয়া দেশীয় নৌকা সকল ওলটপালট খাইতেছে—ঠিক যেন সাহেব-বাঙ্গালীর প্রভেদ সকলকে বুঝাইয়া দিতেছে।

পর পারেই ইংরাজের জয়স্তম্ভ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা দুর্গের পরিখার দিকে ছুটিয়াছে। সন্তানগণের

মঙ্গলকামনায় যেন জগন্মাতা দুই বাহু বেষ্টন করিয়া সেই পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ রক্ষা করিতেছেন। শিবপুরের এই স্থানের ঘাট হইতে ভারতের রাজধানী মহানগর কলিকাতার দৃশ্য কি সুন্দর! প্রথম জাহাজের শ্রেণী—কেমন সারি—সারি—সারি। জাহাজের সেই আকাশভেদী সুদীর্ঘ মাস্তুল যেন উচ্চ কণ্ঠে ইংরাজের বাণিজ্য-ঘোষণা করিতেছে। তাহার পর, আরো ঊর্দ্ধে হাই-কোর্ট, বড় লাটের প্রাসাদ, পোষ্টাফিস প্রভৃতি অসংখ্য সৌধমালা—ইংরাজের সেই বাণিজ্যজাত ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করিতেছে। ঠিক যেন জগন্মাতা সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন—এই দেখ—প্রথম বাণিজ্য, তাহার পর—এই অতুল ঐশ্বর্য্য! অধম বাঙ্গালিসন্তান আমরা আর সে কথায় কর্ণপাত করিব কেন? এখান হইতে মনে হয়—কলিকাতায় বুঝি রাস্তা নাই—ঘাট নাই—আছে কেবল অট্টালিকা—উচ্চ নিম্ন—নিম্ন উচ্চ কেবল অট্টালিকা—কেবল অট্টালিকা! কিন্তু সে পাশাপাশি অট্টালিকারও কি অপূর্ব্ব শোভা!

এ পারের তীরে দাঁড়াইয়া দূর হইতে নির্ম্মলকুমারী একবার সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিল। আর দেখিল, কলকলনাদে সেই কল্লোলিনী গঙ্গা নাচিতে নাচিতে কাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। কোন বাধা মানে না, পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও চায় না, আকুলপ্রাণে কেবল ছুটিতেছে। কেবল কি ছুটিতেছে? ছুটিতেছে আর তরঙ্গায়িত বীচিমালাদ্বারা যেন হস্তোত্তলন করিয়া নির্ম্মলকুমারীকে ডাকিতেছে!

যেন সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীগুলি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিতেছে,—"আয় নির্ম্মল—আমার কাছে আয়।" গঙ্গা ত অবিরাম গতিতে

অনন্তে মিশিতে চলিয়াছে? তবে নির্ম্মলকুমারীকেও কি সেই অনন্তে মিশিতে ডাকিতেছে? নির্ম্মল যাহা চায়, তবে তাহাই ত সুখে দেখিতে পাইল। তখন কি সে অনন্তের টানে নির্ম্মল আর স্থির থাকিতে পারে? সুতরাং স্রোতস্বিনীর আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া—তীর হইতে তীরবেগে সেই অনন্ত-স্পর্শিনী পবিত্রসলিলা গঙ্গায় গিয়া নির্ম্মলকুমারী ঝাঁপ দিল! পার্শ্বস্থিতা পরিচারিকা—"কি কর—কি কর" বলিয়া একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল! আর একটা লোক নির্ম্মলকুমারীর পতনে তরঙ্গায়িত গঙ্গাবক্ষ স্থির হইতে না হইতেই নক্ষত্রবেগে সেই স্থানে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিল! মুহূর্ত্তের মধ্যে দুই জনেই অদৃশ্য হইল। সব ফুরাইল!

আকুল প্রাণে স্তম্ভিত হইয়া স্নানের ঘাটের নর-নারীগণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিল! এই আকস্মিক ঘটনায় সকলেই যেন একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল! নির্ব্বাক্‌ ও নিস্পন্দভাবে সকলেই, সেই গঙ্গাবক্ষের নির্দ্দিষ্ট স্থানের প্রতি আকুল-প্রাণে চাহিয়া রহিল। ক্রমে জল স্থির হইল—আশা ডুবিল। জল নড়িল—আশা জাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই মূর্ত্তি জলের উপর ভাসিল—একটি স্ত্রীমূর্ত্তি—মৃতপ্রায় ও অচৈতন্য, আর একটি জীবন্ত ও সজ্ঞানযুক্ত পুরুষ মূর্ত্তি। পুরুষ মূর্ত্তি সেই মৃতপ্রায় স্ত্রীমূর্ত্তিকে টানিয়া লইয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিল। তীরে তখন একটা আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল।

আনন্দের পর বিস্ময়। মূর্ত্তিদ্বয় তীরে আসিয়া পৌঁছিলে, আনন্দোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে যে, সেই দুই মূর্ত্তি দেখিল, সেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। স্ত্রীমূর্ত্তি নির্ম্মল—নির্ম্মল যে স্নান করিতে সে ঘাটে আসিয়াছিল, এতক্ষণ তাহা কেহ দেখে নাই। আর

সেই পুরুষ মূর্ত্তি—খগা-পাগ্‌লা। খগা-পাগ্‌লাও যে সে ঘাটে কখন আসিল, তাহাও কেহ জানে না। তাহার পর সকলেই নির্ম্মলকুমারীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইল। সে সময় তাহার প্রতি কাহারও ক্রোধ ছিল না। খগা-পাগ্‌লাও সকলের সহিত সেই শুশ্রূষায় যোগ দিল। তাহারই যত্নে ও চেষ্টায় নির্ম্মলকুমারী চক্ষুদ্বয় ঈষৎ উন্মিলন করিল। তাহার সেই অর্দ্ধবিস্ফারিত চক্ষু প্রথমেই সেই খগা-পাগ্‌লার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষুদ্বয় এখন পূর্ণবিস্ফারিত— দিনমণির আগমনে যেন কমলিনী বিকশিত। ধীরে ধীরে পুনরায় সেই চক্ষুদ্বয় নীমিলিতও হইল বটে, কিন্তু নির্ম্মলকুমারীর আর মরা হইল না!

তখন সেই স্ত্রীলোকদিগের স্নানের ঘাটে একটা প্রকাণ্ড জনতা জমিয়া গেল। পুরুষগণও এই ঘটনায় সেই স্ত্রী গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া জনতায় যোগ দিল। অনেক যত্নে নির্ম্মলকুমারীর সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে আনন্দ কোলাহলের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িল। পাগলের এই আশ্চর্য্য কাণ্ডের জন্য সকলেই একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন সে পাগলকে সকলে খুঁজিল, কেহই সে স্নানের ঘাটে তাহাকে আর দেখিতে পাইল না!

এমন সময় নির্ম্মলকুমারীর জননী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌছিল। কন্যাকে জীবিতা দেখিয়া তাঁহার সে ক্রন্দনের কিন্তু হ্রাস হইল না। তখন একখানি পাল্কী আনাইয়া সেই পাল্কীতে নির্ম্মলকে গৃহে লইয়া যাওয়া হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এত করিয়াও নীলমণি মুক্তকেশীকে রাজী করিতে পারিল না। মুক্তকেশীর এখন একটু একটু চৈতন্য হইতেছে, সে আর মোকর্দ্দমায় টাকা খরচ করিতে সম্মত নহে। আর এত টাকাই বা সে কোথায় পাইবে? প্রথমে দুই তিন হাজার টাকা মাত্র খরচ হইবে, তাহাকে বলা হয়, কিন্তু এখন পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি মোকর্দ্দমা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, ক্ষিরোদার জামাতা নীলমণি এই মোকর্দ্দমায় একপ্রকার বড়লোক হইয়া গেল, আর ক্ষিরোদার সাংসারিক দুঃখও এখন এই উপলক্ষে ঘুচিয়া গিয়াছিল! মুক্তকেশীর আর যে কিছু টাকা ছিল, তাহা তখন পরহস্তগত সুদের লোভে কর্জ্জ দিয়াছে, সুতরাং আজ যখন নীলমণি আসিয়া আর এক হাজার টাকার জন্য মুক্তকেশীকে ধরিল, তখন মুক্তকেশীর হস্তে সে টাকা ছিলও না; আর থাকিলেও সে দিত না। কিন্তু কাল মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য আছে, আজ ব্যারিষ্টারকে টাকা দিতেই হইবে, সুতরাং নীলমণির এ টাকাটা আজ বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বে ব্যারিষ্টারকে দিব বলিয়া যে টাকা নীলমণি লইয়াছিল, তাহা ত নিজেই উদরসাৎ করিয়াছে, একবার যাহা সে উদরসাৎ করে, তাহা বাহির করা নীলমণির

অভ্যাস ছিল না। সুতরাং মুক্তকেশী টাকা দিতে অস্বীকার হওয়ায়, নীলমণি আজ বড় গোলযোগে পড়িয়াছে।

নীলমণিকে পরাস্ত হইতে দেখিয়া, তখন ক্ষিরোদাসুন্দরী আসরে নামিল। বাস্তবিক, ক্ষিরোদার কি একটা মোহিনী শক্তি ছিল, সে শক্তি অন্য কাহারও উপর খাটুক আর না খাটুক মুক্তকেশীর উপর পূর্ণমাত্রায় খাটিত। ক্ষিরোদাসুন্দরী তখন কহিল—"মা, তোমার একটি কথা বলি—তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে বলেই, তোমায় বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছি। তোমার মতন বুদ্ধিওলা মেয়ে খুঁজে পাই না। তা মা, এত কাণ্ডকারখানা করে, শেষ ঘাটে এনে, ভরা-ডুবি কি করবি মা? কালই আম্‌রা মোকর্দ্দমা জিত্‌বো—এই হাজার টাকাই তোমার শেষ খরচ জেন। অল্পের জন্য কি সব মাটি কর্‌বি? তাহলে আমরা লোকের কাছে মুখ দেখাবো কেমন করে? তুমি ত আমার অবুজ মেয়ে নও মা?"

ক্ষিরোদার কথায় মুক্তকেশী একটু নরম হইয়া কহিল—"আমি টাকা আর কোথায় পাবো পিসী-মা? আমায় তোম্‌রা ২।৩ হাজার টাকা খরচ হবে বলেছিল, এখন পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করেও, আমি থই পাচ্‌ছি না।"

ক্ষিরো। কত টাকা খরচ হয়েছে বল্‌লি মা?

মুক্তকেশী। কেন—পঁ-চি-শ হা-জা-র।

ক্ষিরো। তাতে কত গণ্ডা হয়? দেখ্‌ মা, টাকার হিসাবটা আমি গণ্ডায় বল্‌লেই বুঝ্‌তে পারি।

মুক্ত। ঐ যে তোমার গণ্ডার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। এখন আর গণ্ডার হিসাবের মধ্যে নেই।

নীলমণি এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল, এইবার সুযোগ বুঝিয়া কহিল—গণ্ডা ছাড়াবে কেন বল? আমরা এখন বে-হিসাবী খরচ কখন করি না। আমি মাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মা, তুমি হাজার টাকা কাকে বলে জানত?"

ক্ষিরো। জানি বাবা, জানি। সে নাকি একশো গণ্ডারও বেশী।

নীল। সেই রকম ছ'গণ্ডা এক হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। গণ্ডা ছাড়িয়ে আর কি করে গেলুম বল?

তখন ক্ষিরোদার মুখে আর হাসি ধরে না! নিশ্চয়ই এ সময় তাহার প্রাণের ভিতর একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। ক্ষিরোদা হাসিতে হাসিতে কহিল—"বেশ বুঝেছি বাবা—এখন বেশ বুঝেছি। ও মুক্ত, তোর ভগিনী-পতির কেমন বুদ্ধি দেখেছিস্! এত টাকার হিসাবটা আমায় কেমন এক কথায় বুঝিয়ে দিলে। তোর মোকর্দ্দমাও ঐ রকম করে নাকি জজ সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়েছে। মা, কালীঘাটের কালী করুন, তুমি কালই মোকর্দ্দমায় জয়ী হও, আর আমার ত ঐ সবে-ধন নীলমণি, ও যেন আমার প্রাতঃবাক্যে চিরজীবি হয়ে বেঁচে থাকে।"

নীল। আর এ মোকর্দ্দমায় যা কিছু খরচ হচ্ছে, সেত সব কড়ায় গণ্ডায় ধরে পাবে। মোকর্দ্দমা যখন ডিক্রি হবে, তখন আয় খরচা ডিক্রি হয়ে যাবে। তুমি ত দিদি, আমায় দু এক হাজার—দুশো পাঁচ-শো করে, এই টাকাটা দিচ্ছ—তখন পাঁচশ হাজারের জায়গায় একবারে ত্রিশ হাজার টাকা গণে নিও না দি। খরচা যাতে বেশী ধরে নিতে পারি, আমি যে তার পথ করে রাখছি।

মুক্ত। আর যদি মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়?

ক্ষিরো। ওমা! তুই অমন কথা কি করে মুখে আন্‌লি মা! তোর-কথা শুনে, যে আমার প্রাণটা একবারে ধড়ফড় করে উঠছে!

নীল। তোমার সে ভয় নেই দিদি। আমি সে পথ যে বন্ধ করে দিয়েছি।

তাহার পর একবার চারিদিক চাহিয়া চুপি চুপি কহিল—"কেন তোমায় সে কথা ত কতবার আমি বলেছি দিদি। ভয় একটু হয়েছিল বলেই ত একবারে আট হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে যিনি ডিক্রী ডিস্‌মিসের কর্ত্তা তাঁকেই হাত কর্‌লুম। এই সব কাণ্ডকারখানা কর্‌তে হয়েছে বলেই ত এত টাকা খরচ। লক্ষ্মী দিদি, আর এক হাজার টাকা আমায় দাও, আমার মুখ রক্ষা হক—নইলে লোকে আমারই মুখে চূণ-কালী দেবে যে।"

ক্ষিরো। আহা! তোর মোকর্দ্দমার কথা ভেবে ভেবে বাছা আমার দিন দিন কালী হয়ে যাচ্ছে। আর তোরই কি সে চেহারা আছে মা? আহা! তেমন রূপ, তেমন চেহারা ত আমার চখে আর লাগে না।

মুক্ত। আচ্ছা পিসী-মা, আমার হাতে ত আর টাকা পয়সা কিছুই নাই—কেবল আমার গহনা ক'খানি আছে। তাই বন্ধক রেখে না হয়, কোথাও থেকে এক হাজার টাকা ধার করে নিয়ে যাও।

তখন ক্ষিরোদা একবার নীলমণির মুখের দিকে চাহিল। নীলমণি তখন কহিল—"কাজেই তাই কর্‌তে হবে, এত টাকা যখন খরচ হয়ে গেছে, তখন এ কাজ ও আমায় কর্‌তে হবে।"

মুক্তাকেশী তখন বহুকষ্টে তাহার শেষ সম্বল সেই অলঙ্কারগুলি আনিয়া দিল। বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া নীলমণি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

পর দিন মুক্তকেশীর মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য ছিল। বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে নীলমণি আদালতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় প্রথমে সকল দেবতাকে প্রণাম করিল, তাহার পর, খাশুড়ীঠাকুরাণীকেও প্রণাম করিল। সর্ব্বশেষে সম্পর্কে বড় বলিয়া, মুক্তাকেশীকেও ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। মুক্তাকেশী তাহার আশা পথ চাহিয়া রহিল এবং সে দিন আর আহারাদি না করিয়া উপবাসী থাকিল। সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া কেবল ঠাকুর-দেবতার নিকট মাথা খুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, আর গললগ্নীকৃতবাসে কাতরকণ্ঠে মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছিল—"বাবা তারকনাথ, আমি তোমার ভাল করে পুজো দেবে ঠাকুর, আজ যেন আমি এ মোকর্দ্দমায় জয়ী হই। হে মা কালীঘাটের কালী, আমি তোমায় জোড়া পাঁটা দিয়ে পূজো দেবো মা, আজ যেন আমার মুখ রক্ষা হয়। হে মা মেলাই চণ্ডী, আমি তোমায় সোনার নত গড়িয়ে দেবো মা, আজ যেন আমার মুখে চুণ-কালী না পড়ে!"

বেলা পাঁচটা অবধি মুক্তাকেশীর এইরূপে কাটিয়া গেল। তাহার পর, মুক্তাকেশী এক বারে হানটান করিতে লাগিল। ক্ষিরোদা ত এখন পূজার উদ্যোগেই ব্যস্ত। সেও আজ উপবাসী রহিয়াছে, মোকর্দ্দমার জয়ের সংবাদ পাইলে, তাহার পর ঠাকুরের মানসিক পূজা দিয়া তবে আজ জলগ্রহণ করিবে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, নীলমণির আর দেখা নাই। নিশ্চয়ই আজ রাত্রি

পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা চলিতেছে, তাহা না হইলে এখনও নীলমণি ফিরিল না কেন? মুক্তকেশী ও ক্ষিরোদা তখন এইরূপ কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, তখনও নীলমণির দেখা নাই! এমন সময় সেই খগা-পাগ্‌লা রাস্তা দিয়া গাহিয়া চলিয়াছিল:—

"যশোদা, তোর নীলমণি
ব্রজে আর আস্‌বে না।
মথুরায় হয়েছে রাজা,
জেনে কি তা জানো না?

গানটা শুনিয়া মুক্তকেশীর প্রাণটা যেন একবারে শিহরিয়া উঠিল! ক্ষিরোদা কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"তুমিও যেমন মা,—পাগলে কি না বলে মা, আর ছাগলে কি না খায় মা?"

এমন সময় নগেন্দ্র নাগের বাড়ীতে হঠাৎ শাঁক ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল! সে শাঁক-ঘণ্টার শব্দে মুক্তকেশীর হৃদয়ে যেন একবারে বজ্রাঘাৎ হইল! এমন সময়ে ক্ষিরোদার কন্যা আসিয়া কহিল—"ও-মা! কি সর্ব্বনেশে কথা শুনছি! কামিনী-ঝির মুখে শুনে এলুম—ওদেরই মোকর্দ্দমা জিৎ হয়েছে, তাই এখন বাড়ীতে সত্যনারায়ণের কথা হচ্ছে।"

সে সংবাদে মুক্তকেশী একবারে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল! কিছুক্ষণ মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকিয়া তাহার পর একবারে সশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা গো, একবার তুমি এসো গো, ও বাবা, তুমি বিহনে তোমার সেই আদরের মেয়ের কি দুর্দ্দশা হয়েছে, একবার দেখে যাও গো!"

আর ক্ষিরোদাও তখন চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, নগেন্দ্র, কালী মুখুর্য্যে, জানকী প্রভৃতি—তখন যাহার নাম মনে উদয় হইতে লাগিল, তাহাকেই গালি দিয়া ভূত ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল!

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলকুমারীর মরা হইল না। কোথা হইতে এক পাগল আসিয়া তাহার বড় সাধে বাদ সাধিল। সে দিনের ঘটনা যে শুনিল সেই এই পাগলের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কি জানি কেন, নির্ম্মলকুমারীর প্রতি সকলের যে একটা ঘৃণা ও ক্রোধ ছিল, এই ঘটনায় তাহারও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। এখন গ্রামে খগা-পাগলের বড় আদর বাড়িয়া গেল, বিশেষতঃ নির্ম্মলকুমারীর পিত্রালয়ে। গঙ্গাস্নানের ঘটনার দিন অনেক অনুসন্ধান করিয়াও, সে পাগলকে আর কেহ সে গ্রামে খুঁজিয়া পাইল না। পর দিন নির্ম্মলকুমারীর ভ্রাতা অনেক কষ্টে তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিল। পাগল বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলেই, একটা আনন্দের ধ্বনি পড়িয়া গেল। বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং আসিয়া পাগলের অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কর্ত্তা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু, তোমার বাড়ী কোথায় ?"

অন্য সময়ে পাগল হয় ত এ প্রশ্নের উত্তরে হস্তস্থিত যষ্টি গাছটি দেখাইত, না হয় উত্তর করিত—"আকাশের নীচে।" কিন্তু কর্ত্তা বাবুর প্রশ্নে সে রকম কোন উত্তর না দিয়া পাগল

বিনীতভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে, যখন যেখানে থাকি, সেই-খানেই আমার বাড়ী। এখন এখানে আছি—এই আমার বাড়ী।"

কর্ত্তা। আচ্ছা, তোমার নাম কি?

পাগল। খগা-পাগলা।

কর্ত্তা। পদবী কি? খগা-পাগলা বল্‌লে কি বুঝ্‌বো?

পাগল। সবাই আমায় "খগা-পাগলা" বলেই ডাকে।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তোমরা কি জাতি?

পাগল আপনার যজ্ঞোপবিত দেখাইল। তখন কর্ত্তা কহিলেন —"তোমায় ত সে রকম পাগলা মনে হয় না। আর কথা-বার্ত্তায় বোধ হয়, তুমি কোন বড় বংশের ছেলে হবে—তুমি এমন করে ঘুরে বেড়াও কেন?"

পাগল। একস্থানে স্থির থাক্‌তে পারি না—তাই ঘুরে বেড়াই।

কর্ত্তা। তোমার মা-বাপ আছেন?

পাগল। না।

কর্ত্তা। ভাই-ভগিনী আছে?

পাগল। না।

কর্ত্তা। স্ত্রী আছে?

পাগল। আছে।

কর্ত্তা। সেই স্ত্রীর মুখ চেয়েও, তুমি কি ঘরে থাক্‌তে পার না? মনে করে দেখ দেখি—তোমায় না দেখ্‌তে পেলে, তোমার স্ত্রীর কত কষ্ট হয়? তোমার বাড়ী কোথায় বল—আমি তোমায় বাড়ী রেখে আস্‌বো।

পাগল এতক্ষণ ধীর ও শান্তভাবে বিজয় বাবুর কথার উত্তর দিতেছিল, কিন্তু এইবার সে উত্তর বন্ধ করিল। পাগল কিছুক্ষণ একবারে শুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। বিজয় বাবুর কোন কথার আর উত্তর দিল না।

এতক্ষণের পর এইবার পাগল পাগ্‌লামী আরম্ভ করিয়া দিল। তাহা দেখিয়া বিজয় বাবু পাগলকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু পাগলকে সেদিন সেই খানে স্নানাহার করিতে বলা হইল। পাগল তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। যথাসময়ে অন্দরের মধ্যে আহার করিতে পাগলকে লইয়া যাওয়া হইল। আজ নির্ম্মলকুমারীর জননী কন্যার জীবনরক্ষক বলিয়া অতি যত্নের সহিত স্বহস্তে পাগলের জন্য নানা অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন। আহার করিতে গিয়া পাগল সেই আয়োজন দেখিয়াই হাসিল। পাগলের মনে কখন কি ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বলিতে পারে? এখনকার এই হাসিও কিন্তু পাগলের হাসি নহে। পাগলের হাসি অর্থশূন্য, কিন্তু এ হাসি যেন অর্থপূর্ণ। যাহা হউক, পাগল আহারে বসিল। সেই নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পরিতোষের সহিত পাগল আহার করিতে আরম্ভ করিল। আহার করিতে করিতে পাগল দেখিল—অদূরে উপরিস্থিত একটি গবাক্ষে বসিয়া একটি স্ত্রীলোক একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরেই পাগল বুঝিল যে, এই স্ত্রীলোক অন্য কেহ নহে—সেই নির্ম্মলকুমারী। নির্ম্মলকুমারী কি কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার জীবনরক্ষকের প্রতি এখন একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে? এ দৃষ্টি ত সে ভাবের নয়। এ কি! নির্ম্মলকুমারীর এত ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে কেন? নির্ম্মল-

কুমারী পাগলকে দেখিতে দেখিতে যে একবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে! পাগলের আর আহার হইল না। অবনতমস্তকে পাগল বসিয়া রহিল, আর চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দুর টস্ টস্ পতনে অন্ন-ব্যঞ্জন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মলকুমারীকে দেখিয়া পাগল নীরবে এরূপ ভাবে কাঁদে কেন? হঠাৎ পাগলের মনে এ কি ভাবের উদয় হইল? একটা পূর্ব্বস্মৃতির তীক্ষ্ণ জালায় সেই সময় পাগল যেন একবারে অস্থির হইয়া প'ড়িল। কিন্তু পাগলের আবার পূর্ব্বস্মৃতি আছে নাকি?

আহারের আয়োজন দেখিয়া যে পাগল প্রথমে হাসিয়াছিল, আহার করিতে করিতে সে পাগল আবার কাঁদিয়া আকুল হয় কেন? হঠাৎ নির্ম্মলকুমারীর জননীর দৃষ্টি পাগলের দিকে আকর্ষিত হইল, তিনি তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া কহিলেন— "কেন বাবা, তুমি কাঁদ?"

এই সময় দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া নির্ম্মল সেই গবাক্ষ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল! নির্ম্মলকুমারীর জননীর সান্ত্বনায় পাগলের সে ক্রন্দনের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতক্ষণ পাগল নীরবে কাঁদিতেছিল, এইবার একবারে ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নির্ম্মলের জননী তাহাকে নানারূপ প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পাগল প্রকৃতিস্থ হইল। কিন্তু পাগলের আর আহার করা হইল না! সে অন্দর হইতে দৌড়িয়া সদর বাড়ীতে গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাগল সদর বাড়ীতে আসিয়া দেখিল যে, বিজয় বাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পাগল তখন ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় শুনিল বিজয় বাবু সেই ব্যক্তিকে বলিতেছেন—"প্রকাশ বাবু, আপনি নগেন্দ্র বাবাজীকে বল্‌বেন—তিনি নিজে এসে যদি আমার কন্যাকে নিয়ে যান, এতে আমার কোন আপত্তিই নাই।"

বিজয় বাবুর কথা শুনিয়া, সে বাড়ী হইতে পাগলের আর যাওয়া হইল না। উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়, এমন একস্থানে পাগল বসিল। নগেন্দ্রনাথের বন্ধু প্রকাশচন্দ্র তখন কহিলেন—"তা হলে, আজই নগেন্দ্র বাবু আস্‌ছেন, আজই আপনার কন্যাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

কর্ত্তা এ প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—"আমার এতে কোন আপত্তি নাই, তবে একবার বাড়ীর ভিতর জিজ্ঞাসা করে, এ কথার উত্তর আপনাকে এখনি দিচ্ছি।"

এই কথার পর, কর্ত্তা অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন খগা-পাগলা সেই প্রকাশ বাবুকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন—"এত দিন পরে, তোমাদের বাবুর স্ত্রী বলে মনে পড়েছে নাকি ?"

প্রকাশ বাবু একবার ঘৃণার চক্ষে পাগলের দিকে চাহিলেন, তাহার প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিলেন না। পাগল পুনরায় কহিল—"আমার কথার উত্তর না দাও—একটা কথা তোমার বাবুকে বলো—ষোলকলা পূর্ণ হতে চল্‌লো, আর দেরী নাই।"

প্রকাশ বাবু পাগলের এ কথারও উত্তর দিলেন না। তাহা দেখিয়া, পাগল ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গেল। এ বাড়ীতে পাগলের কোন স্থানেই যাইতে নিষেধ ছিল না। এদিকে কর্ত্তা মহাশয় অন্তঃপুরে আসিয়া প্রথমে গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন। গৃহিণী সে সংবাদে আহ্লাদিতা না হইয়া বরং দুঃখিতা হইলেন। কারণ, তিনি কন্যার অভিপ্রায় ভালরূপই জানিতেন। কর্ত্তা কন্যার অভিপ্রায় জানিতে অভিলাষী হইলে,গৃহিণী কহিলেন—"শুধু আমার কথায় হবে না। তুমিও আমার সঙ্গে একবার এসো না।"

তখন কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই নির্ম্মলকুমারীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গৃহিণী নির্ম্মলকে কহিলেন—"মা, তোমার স্বামী তোমায় আজ নিয়ে যেতে চান্, যখন তিনি নিজে তোমায় নিয়ে যেতে আস্‌ছেন, তখন লক্ষ্মী-মা আমার, আর কোন অমত করো না। এ বুড়ো-বুড়ীর একটা কথা রাখ মা—তুমি এ কথা না রাখ্‌লে আম্‌রা আজই কাশীবাসী হবো।"

নির্ম্মলকুমারী অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। তাহার পর কহিল—"মা, এবার তোমাদের কথা রাখ্‌বো—আমি সেই খানেই যাবো,

তবে মা, আজ যাবো না, দুদিন সময় দাও, আজ সোমবার—এই আস্‌ছে বুধবার যাবো।”

কন্যার এই কথায় কর্ত্তা-গৃহিণী উভয়েই আহ্লাদিত হইলেন এবং কর্ত্তা প্রকাশ বাবুকে সেই সংবাদ দিতে সদর বাড়ীতে গেলেন। আর গৃহিণীও কি স্থির থাকিতে পারেন? কন্যার শ্বশুর-বাড়ী যাইবার এই সম্মতি-সংবাদ তখন সকলকে জানাইতে দৌড়িলেন। নির্ম্মলকুমারী এইবার তাড়াতাড়ি দ্বিতল হইতে নিম্নতলে আসিয়া একজন ঝির হস্তে একটি টাকা দিয়া কহিল—“গোপালের মা, তোকে একটি কাজ কর্‌তে হবে, যেখানে পাস্ সন্ধান করে, সেই পাগলকে সংবাদ দিয়ে আস্‌বি যে, আমি এই বুধবার শ্বশুর-বাড়ী যাবো। এ সংবাদ দিয়ে এলে, আমি তোকে আর পাঁচ টাকা দেবো—এখনই যা. দেরী করিস্ না।”

সেই ঝি ত হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ম্মলকুমারীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! মুহূর্ত্ত পরেই, নির্ম্মলকুমারীর পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—“আর দেরী নাই, ষোলকলা পূর্ণ হতে চল্‌লো—আর দেরী নাই।”

নির্ম্মলকুমারী বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—অন্য কেহ নহে—সেই পাগল!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার অভয়াচরণ বাবুর আজ বড় বিপদ। তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। ডাক্তারী চিকিৎসায় এ পীড়ার নাম 'ডিপ্‌থিরিয়া।' পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া, ডাক্তার বাবু একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তখন চিকিৎসার ভার নিজ হস্তে না রাখিয়া, অন্য এক জন বিচক্ষণ ডাক্তারের হস্তে দিলেন। কিন্তু তাঁহার চিকিৎসায় রোগের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা গেল। তখন ডাক্তার বাবু কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ সাহেব ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। যখন সাহেব ডাক্তার বাড়ীতে আসিল, তখন সৌদামিনীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! পুত্রের পীড়া যে সাংঘাতিক হইয়াছে, গত তিন দিন সৌদামিনী তাহা বুঝিতে পারে নাই—আজ সাহেব ডাক্তার দেখিয়াই তাহা বুঝিল। সাহেবের রোগী-পরীক্ষা হইয়া গেল—সাহেব বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুও বাহিরে আসিলেন। কিন্তু সৌদামিনীর প্রাণ তখন বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু বাহির বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব হইল, কিন্তু এই অর্দ্ধঘণ্টাকাল সৌদামিনীর যেন এক যুগ মনে হইতে লাগিল। ডাক্তার ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়াই,

সৌদামিনীর প্রাণ যেন উড়িয়া গেল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি কহিল—"সাহেব ;কি বলে গেল ? খোকার ব্যারাম শক্ত হয়েছে না কি ?"

ডাক্তার বাবু একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"তা কি এখনও বুঝ্‌তে পার নাই ?"

সৌদা। সে কি ! তোমার কথা শুনে যে আমার ভয় হচ্ছে ! ভাল হবে ত ?

ডাক্তার। সকলই ভগবানের হাত।

"ভগবানের হাত কিগো !—"এই কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে সৌদামিনী স্নেহের আবেগে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া লইল। এই সময় চক্ষের জলও আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সৌদামিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন—"তুমি কাঁদ কেন ? যখন এত চেষ্টা করা যাচ্ছে, তখন আরাম হবে না কেন ?"

তিন বৎসরের শিশুপুত্র জননীকে কাঁদিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল—"তুই কাঁদিস্‌নে মা, আমি আলাম হবো।"

জননী চক্ষের জল মুছিয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। তাহার পর, সৌদামিনী পুত্রকে সস্নেহে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীকে কহিল—"ওগো, আমার প্রাণ এমন করে কেন ? তুমি সত্যি করে বলো—আমার খোকা বাঁচ্‌বে তো ?"

এতক্ষণের পর ডাক্তার বাবুরও চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল, তিনি সেই ছলছলনেত্রে কহিলেন—"সৌদামিনী, ভগবানকে ডাক, তিনিই বাঁচাবার কর্ত্তা—এ বিপদে তিনি রক্ষা না কর্‌লে, আর উপায় নাই। কাঁদ্‌লে কি হবে ?"

সৌদামিনী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল—"আমি যে

স্থির হতে পারছি না—আমার প্রাণের ভিতর এমন করছে কেন? ওগো, তুমি ভগবান্‌কে ডাক না।”

ডাক্তার বাবু তখন আর স্থির থাকতে পারিলেন না। উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“সৌদামিনী, আমি মহাপাপী, আমার ডাকা ভগবান শুন্‌বেন না—তাই তোমায় ডাকতে বলছি।”

সৌদা। ওগো, আমরা এমন কি পাপ করেছি যে, আমাদের এমন সর্ব্বনাশ হবে!

এমন সময় কালীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সৌদামিনী অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। তিনি উভয়কে দেখিয়া কহিলেন—“এ কি! তোমরা দু'জনেই কাঁদতে বসেছ! মা লক্ষ্মী, তুমি ছেলে কোলে করে কাঁদছ! এতে যে ছেলের অকল্যাণ হয়, তা কি জান না মা? আর ডাক্তার বাবু, তুমিও এমন ছেলেমানুষী করছ? তুমি একজন বিচক্ষণ ডাক্তার হয়ে, রোগীর সাম্‌নেই বসে কাঁদছ? এতে রোগের যে বৃদ্ধি পায়। আমি বলছি তোমার ছেলে আরাম হবে।”

সৌদামিনী তখন বাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠে পার্শ্বস্থিতা ঝিকে কহিল—“একটু পায়ের ধূলা দিতে বল্।”

কালীকুমার বাবু তখন আপনার পদধূলি লইয়া রোগীর গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—“আজ কেমন আছ দাদামণি?”

রোগী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ উদাস-ভাবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—“ভাল নই।”

এই সময় রামকুমার ডাক্তার এক শিশি ঔষধ হস্তে সেই গৃহে আসিয়া কহিলেন—"একদাগ এখনই খাইয়ে দাও।"

কালী। আপ্‌নি খাইয়ে দিন্।

রামকুমার বাবু তখন একটি মেজার-গ্ল্যাসে ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে একমাত্রা ঔষধ সেবন করাইলেন। কিন্তু এ কি! সে ঔষধ গলাধঃকরণ হইতেছে না কেন? কি সর্ব্বনাশ! রোগীর চক্ষু কপালে উঠিতেছে কেন? কাহারও যে আর হাত পা আসিতেছে না! আকুল প্রাণে সকলেই যে রোগীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। এ কি! রোগী এমন করে কেন? সে দৃশ্য দেখিয়া জননীর প্রাণ তখন কি আর স্থির থাকিতে পারে? সৌদামিনী একবারে ডাক-ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইল—কাঁদিতেও নিষেধ করা হইল; কিন্তু সৌদামিনীর প্রাণ সে আশ্বাসে প্রবোধ মানিল না—সে কাঁদিতে নিষেধও আর শুনিল না। তাহার সেই হৃদয়ভেদী চীৎকারে তখন চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিল। গৃহ লোকে লোকারণ্য হইল। রোগীকে বাঁচাইতেও সে সময় অনেক চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হইল না! সব আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে অনেকেই সে গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। একটা ভয়ঙ্কর হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিল। সব ফুরাইল!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসার যন্ত্রণাময়। এ সংসার মোহে মুগ্ধ হইয়া লোকে অহরহ কেবল যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া থাকে। রোগের যন্ত্রণা, শোকের যন্ত্রণা, অভাবের যন্ত্রণা, স্বভাবের যন্ত্রণা, ভোগের যন্ত্রণা ক্ষোভের যন্ত্রণা—এ সংসারের ত ষোল-আনাই যন্ত্রণা। আবার যেরূপ দুঃখের যন্ত্রণা হয়, সুখেরও অনুরূপ একটা যন্ত্রণা আছে। যেরূপ অপমানের যন্ত্রণা হয়, মানেরও অনুরূপ একটা যন্ত্রণা আছে। যেরূপ নিরানন্দের যন্ত্রণা হয়, আনন্দেরও অনুরূপ একটা যন্ত্রণা আছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—এ সংসারে যন্ত্রণা নাই কোথায়?

তবে সকল যন্ত্রণা অপেক্ষা এই আত্মীয়-বিয়োগজনিত শোকের যন্ত্রণাই অধিকতর কষ্টদায়ক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আবার সকল শোকের যন্ত্রণা অপেক্ষা পুত্রশোকের যন্ত্রণার ন্যায় মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা বুঝি, এই যন্ত্রণাময় পৃথিবীতেও আর দ্বিতীয় নাই। অতি বড় শত্রুকেও যেন কখন এ যন্ত্রণা স্পর্শ না করে। এই যন্ত্রণার কথা অন্যকে বুঝাইতে পারা যায় না—এ যন্ত্রণা অব্যক্ত ও বর্ণনাতীত। ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ এ যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতেও পারে না। এককালীন সহস্র বৃশ্চিকদংশন বরং অম্লানবদনে সহ্য করা যায়, কিন্তু এই পুত্র-বিয়োগজনিত শোক তাহা অপেক্ষায়ও ভয়ঙ্কর!

ডাক্তার অভয়াচরণ বাবু এখন এই পুত্রবিয়োগজনিত শোকের যন্ত্রণায় অস্থির। অভয় বাবুর একমাত্র পুত্রের গত কল্য মৃত্যু হইয়াছে। অভয় বাবুর অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলই রহিয়াছেন, কিন্তু এই পুত্রবিয়োগে তিনি মনে করিতেছেন যে এ পৃথিবীতে তাঁহার আর কেহ নাই। কাল এ পৃথিবীর যেখানে যাহা ছিল, আজও সেইখানে তাহাই রহিয়াছে, তথাপি তাঁহার মনে হইতেছে—এ পৃথিবীতে যেন একটা প্রলয়কাণ্ড হইয়া গিয়াছে! এ সংসারের সৌন্দর্য্য কাল যেরূপ ছিল, আজও ঠিক সেই রূপই রহিয়াছে, তথাপি তিনি মনে করিতেছেন—এ সংসার একবারে শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। কাল তাঁহার মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি যেরূপ ছিল, আজও সেইরূপই আছে, তথাপি তাঁহার মনে হইতেছে—তাঁহার মতন হেয় ও অপদার্থ লোক এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার গৃহ-শোভার দ্রব্যাদিও পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে, তথাপি তিনি আজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন!

এমন সময় লোকের আত্মীয় বন্ধু কেহই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না; সকলেই সান্ত্বনা করিতে আইসেন। অভয় বাবুর আত্মীয় বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁহাকেও আজ অনেকেই সান্ত্বনা করিতে আসিয়াছিলেন। হরকালী মুখোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামের প্রধান প্রধান লোক আজ সকলেই তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত—সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখিত। কেহ আজ আর বৈটকখানায় গিয়া বসেন নাই। ডাক্তার বাবু ডিস্পেনসারীগৃহের সম্মুখের চাতালটার উপর নিরাসনে বিষণ্ণমনে বসিয়াছিলেন, আজ একে একে সকলেই

সেইখানে আসিয়া বসিলেন। আমাদের খগা পাগ্‌লাও সেইখানে একধারে বসিয়াছিল। সকলেই নানারূপ প্রবোধবাক্যে ডাক্তার বাবুকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। হরকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন—"অভয়, তুমিত বোকা বালক নও, জন্ম হইলেই যে মৃত্যু আছে, এত তুমি জান। যার পরমায়ু নাই, কার সাধ্য তাকে ধরে রাখ্‌তে পারে? এমন ঘটনা তুমিও কত শত দেখেছ, কারণ তুমিও একজন ভাল চিকিৎসক।"

এই সময় খগা-পাগ্‌লা বলিয়া উঠিল—"বিশেষত অস্ত্র-চিকিৎসায়।"

পাগলের এ কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, কিন্তু অভয়া-চরণের শোকাকুল হৃদয়ে পাগলের এই অসঙ্গত কথাটা গিয়া একটা আঘাত করিল, তিনি একবার এই সময় পাগলের দিকে চাহিলেন। হরকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আর নিজের ছেলের অসুখ বলে, তুমিত সে চিকিৎ-সার ভার নিজের হাতেও রাখ নাই। কল্‌কেতা থেকে সাহেব ডাক্তার পর্য্যন্ত এনে দেখিয়েছ। রোগের সূত্রপাতের সময় তুমি রোগ জান্‌তে পেরেছিলে, কারণ রোগপরীক্ষায় তুমি নিজেই একজন অদ্বিতীয় ডাক্তার।"

এই সময় সেই খগা-পাগ্‌লা পুনরায় বলিয়া উঠিল—"বিশেষতঃ উরুস্তম্ভের অস্ত্রচিহ্ন পরীক্ষায়!"

পাগলের এই কথায় ডাক্তার বাবুর হৃদয়ে একটা ভীষণ আঘাত করিল! সে আঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সেই নিদারুণ পুত্রশোক পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন! উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া পাগলের নিকট আসিলেন এবং উন্মত্তভাবে পাগলের হাত ধরিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"তুমিত পাগল নও ভাই—কে তুমি যথার্থ পরিচয় দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কর।"

পাগলও তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"সে পরিচয় দেবো—সে পরিচয় দেবো বলেই, আজ এখানে এসেছি। গ্রামের অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন—দেখ্‌ছি। আপনারা এতদিন যাকে খগা-পাগ্‌লা বলে জান্‌তেন, সে খগাও নয়—সে পাগলও নয়! তার যথার্থ নাম স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যা-য়ের ভাগিনেয়—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়! এই ডাক্তার বাবু তার যে উরুস্তম্ভের অস্ত্র করেছিলেন—সেই আমার উরুতে সেই অস্ত্রের চিহ্ন এই!"

এই বলিয়া পাগল আপনার পরিধেয় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া উরুতের একটা অস্ত্রচিহ্ন সকলকে দেখাইল। সকলেই বিস্মিত—সকলেই স্তম্ভিত! কাহার মুখে আর একটিও কথা নাই! 'এ কি সত্য না স্বপ্ন? এ কি প্রকৃত ঘটনা—না প্রহেলিকা? আমরা জাগ্রত না নিদ্রিত?'—অনেকেরই মনে তখন কেবল এই কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু পাগলকে দুই বাহুদ্বারা আপনার বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ভাই নগেন্দ্র, আমায় ক্ষমা কর, আমিই তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি—আমার মত মহাপাপী আর এ পৃথিবীতে নাই। সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দণ্ড হয়েছে—একমাত্র পুত্রধনে আমি বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু পুত্রশোকেও আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই! তুমি ক্ষমা না করলে, আমার সে পাপ কখন মোচন হবে না।"

আমরাও খগাপাগ্‌লাকে এখন হইতে নগেন্দ্রনাথ বলিয়াই

ডাকিব। নগেন্দ্র নাথ ডাক্তার বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন "দাদা—বাল্যকাল হতে, আমি তোমায় জ্যেষ্ঠ সহোদরের মতন দেখি, সেইরূপ সম্মানও করে এসেছি। যদি গ্রহবশতঃ কোন অন্যায় কর্ম্মই করে থাক, তার জন্য আমার কাছে আবার ক্ষমা চাইবে কি? বিশেষতঃ যখন আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম না, কখন যে উপস্থিত হবো—তারও সম্ভাবনা ছিল না। এমন সময় অন্য একজন ব্যক্তিকে যদি গ্রামশুদ্ধ লোকে নগেন্দ্র বলে স্বীকার করে, তাকে তুমি সম্পত্তি ছেড়ে না দেবে কেন? তুমি আমার সম্পত্তি অন্যকে দিয়েছ, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই, তুমি যে আমার সম্পত্তির অধিকারীকে আবার স্ত্রীর স্বামী হতে দাও নাই, এর জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

অভয়াচরণ বাবু তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"ভাই নগেন্দ্র, তোমার যেমন উচ্চ মন, তুমি তেম্‌নি কথাই বল্‌ছ। কিন্তু আমি অতি নীচ—অতি হেয়—অতি মহাপাপী। আমি তোমার বিষয় থেকে অনেক টাকা খরচ করে ঋণগ্রস্ত হই, সেই ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবো বলে, তোমার সম্পত্তি অন্যকে দিয়েছি। আমি সে ব্যক্তিকে নগেন্দ্রনাথ নয় জেনেও, এই পাপ কার্য্য করেছি। আমার মতন পাপী কি আর এ পৃথিবীতে আছে?"

নগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"আছে! তোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর পাপী এ পৃথিবীতে অনেক আছে। তোমায় একজনকে এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। যে জাল নগেন্দ্র সেজে পরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে বস্‌তে পারে, তার মতন পাপী কে? যে পরের সমস্ত সম্পত্তি উপভোগ করেও সন্তুষ্ট না হয়ে, তার সতীসাধ্বী স্ত্রীর অমূল্য সতীত্বরত্ন নষ্ট করবার প্রয়াসী হয়, তার মতন পাপী কে?"

নগেন্দ্র নাথের ক্রোধপ্রদীপ্ত তাৎকালিক মুখমণ্ডল যেন বিদ্যুতালোকিত ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের সদৃশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এই সময় উপস্থিত কয়েক জন যুবা মুহূর্ত্তের মধ্যে পরস্পরে কি একটা পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বিস্মিত ও স্তম্ভিত নগেন্দ্রনাথের শ্বশুর বিজয়কৃষ্ণ বাবুর এতক্ষণ পরে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি নগেন্দ্রনাথকে কহিলেন—"বাবা নগেন্দ্র, আমিও তোমার কাছে বড় অপরাধী হয়েছি। আমি তোমায় চিন্তে পারি নাই। যে নগেন্দ্রনাথের জন্য—"

ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিলেন! তাঁহার মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না। নগেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"সে কি কথা বাবা? আমি আপনার পুত্র, আমিই আপনার নিকট সহস্র অপরাধে অপরাধী। আমায় সে সকল অপরাধ ক্ষমা কর্‌লে আমি কৃতার্থ হবো।"

ব্রাহ্মণ তখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ডাক্তার বাবুকে কহিলেন—"বাবা অভয়াচরণ, আমি তোমার কাছেও অপরাধী আছি। তুমি আমার কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে দিতে না কেন—তুমি সেই পাপীষ্ঠ জাল-নগেন্দ্রটাকে আমার বাড়ী আস্‌তে দিতে না কেন—তুমি উদ্যোগী হয়ে, তার বিয়ে দিলে কেন—এ সকল এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু পূর্ব্বে তোমার এ সকল কার্য্যে, তুমি আমারই শত্রুতা করছ মনে করতুম। তুমিই সতীর সতীত্ব রক্ষা করেছ, কিন্তু আমি কি মহাপাপী দেখ—আমি পিতা হয়ে আপনার কন্যার সতীত্ব নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, আমি—"

ব্রাহ্মণ আর বলিতে পারিলেন না, পুনরায় অজস্র অশ্রুধারায়

তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখন নগেন্দ্রনাথ উন্মত্তভাবে কহিলেন—"সতীর সতীত্ব কখন নষ্ট হবার নয়—এই ঘটনাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! কি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বুঝুন—কি অলৌকিক ঘটনা দেখুন। একবার উচ্চকণ্ঠে সবাই মিলে বলুন—সতীর জয়!"

তখন দিকদিগন্তর কম্পিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হইল—"সতীর জয়!"

প্রতিধ্বনিও উত্তর করিল—"সতীর জয়!"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন সেই জাল-নগেন্দ্র নাথের বিষয় দুই এক কথা বলিব। জাল-নগেন্দ্রনাথ যখন শিবপুরের মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে, তখন কিন্তু সে জাল-নগেন্দ্রনাথ সাজিয়া আইসে নাই। সেই শ্যামা মুদিনী প্রথম তাহাকে নগেন্দ্রনাথ বলিয়া পরিচয় দিল, এবং সে সময় যে তাহাকে দেখিল, সেই তাহাকে নগেন্দ্রনাথ বলিয়া চিনিতে পারিল। এই ঘটনায় তাহার মনে একটা প্রলোভনের উদয় হইল, এবং এই জাল-নগেন্দ্র আর সে প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারিল না। তবে এই জাল-নগেন্দ্র কিরূপে এই গ্রামের ও নগেন্দ্রের বাড়ীর সকলকে চিনিতে পারিল, এবং সে সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। শেষে ডাক্তার বাবু যখন তাহার উরুস্তম্ভের অস্ত্রের চিহ্ন পরীক্ষার জন্য তাহাকে আপন বাড়ীতে লইয়া যান, সেই অস্ত্রচিহ্ন পরীক্ষা করিতে গিয়াই, ডাক্তার বাবুর নিকট এই জাল-নগেন্দ্র ধরা পড়ে। তখন তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, ডাক্তার বাবু নিজের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, তাহার সহিত একটা বন্দোবস্ত করেন। সেই বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্যই, সে দিনকার সেই অস্ত্রচিহ্ন পরীক্ষার সময়, ডাক্তার বাবুর

এত বিলম্ব হইয়াছিল। বন্দোবস্ত ঠিক হইলে, তখন তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া, এই জাল-নগেন্দ্রকে প্রকৃত নগেন্দ্র বলিয়া প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের সমস্ত সম্পত্তি ও তাহার হস্তে অর্পিত হয়। সে বন্দোবস্তের সময় কিন্তু ডাক্তার বাবু নগেন্দ্রনাথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়া ছিলেন যে, সে নগেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে কস্মিনকালে আপনার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। সতীর সতীত্ব বজায় রাখিয়া, কেবল সতীর স্বামীর বিষয় সম্পত্তি উপভোগ করিবে।

কিন্তু এই বিষয়সম্পত্তি উপভোগই এই জাল-নগেন্দ্রনাথের কাল হইল। উপভোগ করিয়া কাহার কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত-সংযোগের ন্যায় সে ভোগাভিলাষ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জাল-নগেন্দ্রনাথেরও তাহাই ঘটিল। অনেক মো-সাহেব, পারিষদ ও বন্ধুবান্ধবও জুটিল। এই জাল-নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের ক্রমেই অধঃপতন হইতে লাগিল। অর্থ না হইলে, ভোগাভিলাষ পূর্ণ হয় না, ক্রমে অর্থেরও অনাটন হইতে লাগিল। তখন জমীদারীর প্রজাগণের উপরও ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করা হইল। অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও তাহার অত্যাচারে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইল। তবে এই জাল নগেন্দ্রনাথ সকল কার্য্যই অতি গোপনে করিত, বাহিরের লোককে কোন কথা জানিতে দিত না; বাহিরে সে একজন ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিত। এরূপ অভ্যাস এই জাল-নগেন্দ্রনাথের বাল্যকাল হইতেই ছিল। কিন্তু পাপ কার্য্য কখন চিরকাল গোপন থাকে না। ক্রমে গ্রামের লোকে এই জাল নগেন্দ্রের স্বভাব-চরিত্রের বিষয় কাণাঘুসা করিতে লাগিল, ক্রমেই

অনেকে তাহা জানিতে পারিল। যাহারা তাহা জানিতে পারিল, তাহারা এই নগেন্দ্রনাথকে মনে মনে ঘৃণাও করিতে লাগিল। কিন্তু এই নগেন্দ্রনাথ ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী—সুতরাং সম্মুখে তাহাকে কোন কথা কহিতে, কেহই আর সাহসী হইল না।

আজ অভয়াচরণ ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে আসল নগেন্দ্রনাথ প্রকাশ হইলে, যে কয়েক জন যুবা সে স্থলে উপস্থিত ছিল, এবং যাহারা কি একটা পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সে স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যায়, তাহারা এই জাল নগেন্দ্রনাথের চরিত্রের বিষয় জানিত। এই ঘটনায় তাহাকে এইরূপ ভয়ঙ্কর প্রতারক এবং প্রবঞ্চকও জানিতে পারিয়া, তাহাদের ক্রোধের আর সীমা রহিল না—এই পাপীষ্ঠকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য তখন তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর দিকে দৌড়িল। রাস্তায় যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনাইল সে সংবাদ যে শুনিল, সেই প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। একটা গোলযোগের সহিত গ্রামের বহুসংখ্যক লোক নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচিরেই নগেন্দ্রনাথের কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণও এই ভয়ঙ্কর প্রতারণার কথা শুনিল। সকলেরই মনে মনে এই জাল নগেন্দ্রনাথের উপর ক্রোধ ছিল, অকস্মাৎ এই লোমহর্ষণ ও ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া, সকলেরই ক্রোধ শত-গুণ বৃদ্ধি হইল। আর শুনিল—স্বয়ং সেই জাল-নগেন্দ্রনাথ! পাপীর মন সর্ব্বদাই ভীত ও শঙ্কিত থাকে। বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে সেই জনতা দেখিয়া আর তাহাদের মুখে দুই এক কথা শুনিয়া, পাপীষ্ঠের জানিতে আর কিছুই বাকি রহিল না।

সেই উন্মত্ত জনতা দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয়ও হইল। তখন তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া আসিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সেই উন্মত্ত জনতায় বাড়ীর নিম্নতল একবারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। "মার্—মার্" শব্দে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল। ঐ বাড়ীর দাসদাসী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্তও তখন সেই উন্মত্ত জনতার সহিত যোগদান করিয়াছিল। জাল-নগেন্দ্র তাহাদেরও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল! তখন সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া একটি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ির দরজা বন্ধ দেখিয়া, সেই উন্মত্ত জনতা আরো একবারে অধীর হইয়া পড়িল। তখন উচ্চকণ্ঠে "মার্—মার্—জুয়াচোরকে মার্" রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় সেই জাল নগেন্দ্রনাথ অধির হইয়া সেই গৃহের মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। এদিকে সেই প্রতি-শোধ-লোলুপ উন্মত্ত জনতা তখন সিঁড়ির দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দরজায় যেমন এক একটি আঘাত পড়িতে লাগিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে এই জাল নগেন্দ্রনাথের মস্তকেও যেন এক একটি বজ্রাঘাত হইতেছিল। পাপীষ্ঠের মনের অবস্থা এখন কিরূপ তাহা বর্ণনা করা যায় না! একে একে তাহার সকল পাপ-রাশি মনে হইতেছিল। আর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেই পাপীষ্ঠ সেই আবদ্ধ গৃহের মধ্যে একবারে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতে লাগিল!

দেখিতে দেখিতে ভীষণ শব্দে সিঁড়ির দরজা ভঙ্গের সংবাদ এই জাল নগেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা

ভয়ঙ্কর "মার্—মার্" শব্দও চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই জাল নগেন্দ্রনাথ তখন মনে মনে করিল—"আমাকে মার্‌তেই সকল লোক ছুটে আস্‌ছে—এমন অপমানের চেয়ে নিজে মর্‌লেই ত সব গোলযোগ মিটে যেতে পারে। এ অপমান অপেক্ষা আত্মহত্যা ত সহস্রগুণে ভাল—আমি আত্ম-হত্যাই করবো। কিন্তু কি উপায়ে করি?"

জাল নগেন্দ্র তখন সতৃষ্ণনয়নে একবার সেই গৃহের চারিদিক চাহিল। কিন্তু সে গৃহ যেন অন্ধকার দেখিল—আত্মহত্যার উপ-যোগী কিছুই দেখিতে পাইল না! এই সময় সেই গৃহের দরজায় দমাদম্ আঘাত পড়িতে লাগিল। লজ্জায়, ভয়ে, অপমানে উন্মত্তবৎ হইয়া জাল-নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল—"খবরদার!" বাহিরে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উঠিল! জাল-নগেন্দ্রের মুখে আর কোন কথা নির্গত হইল না। এই সময় একস্থানে জাল নগেন্দ্র দেখিল যে, বড় বড় লাল অক্ষরে একটা শিশির গাত্রে লেখা রহিয়াছে—"বিষ!"

জাল-নগেন্দ্র তখন দৌড়িয়া গিয়া সেই শিশি আপন হস্তে গ্রহণ করিল। তাহারই পায়ে একটা বেদনার জন্য এই মালি-সের ঔষধ ডাক্তারখানা হইতে আসিয়াছিল। শিশিতে সেই ঔষধ প্রায় পরিপূর্ণই ছিল। জাল-নগেন্দ্র তখন অমৃতজ্ঞানে সেই পূর্ণশিশির তীব্র বিষ-পান করিল! অচিরেই তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। জাল-নগেন্দ্র তখন সেই গৃহস্থিত একটা শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। সে তাহার প্রাণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাও অনুভব করিতে লাগিল। মরণের যে এত যন্ত্রণা তাহা ত এই জাল-নগেন্দ্র জানিত না—সে কথা জানিলে, কি আর সে এ বিষ

পান করে? যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। এই সময় ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তাহার প্রাণ আকুল হইতেছিল। পাপীর মৃত্যুতে বড় সহজ মৃত্যু নহে! তখন বিষের যন্ত্রণা ও পাপের জ্বালা—এই উভয় যন্ত্রণায় সে ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িল!

এদিকে সেই উন্মত্ত জনতার সংবাদ অচিরেই সেই ডাক্তার অভয়াচরণ বাবুর বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল। সে সংবাদে নগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি! কেহ যেন তাহার প্রতি কোন অত্যাচার না করে, সে হাজার পাপিষ্ঠ হউক—সে যে আমার ভাই!"

তখন কালীকুমার বাবুও এ কথায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"ভাই কি রকম!"

নগেন্দ্র। অন্য কেউ নয়—যে সুরেশের জন্য আমি দেশত্যাগী হই, এ যে আমার সেই সুরেশ!

তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সুরেশের এই কাজ!"

ডাক্তার বাবু তখন ধীরে ধীরে কহিলেন—"এ যে সেই, তা আমিই কেবল জান্‌তুম। তাই জেনেই, আমি এই সর্ব্বনাশ করেছি। তখন মনে করেছিলুম—নগেন্দ্র যখন আর দেশে ফিরে এলো না—তখন সুরেশই না হয়—এ বিষয় ভোগ করুক।"

এই সময় নগেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল—"আমি আর এখানে অপেক্ষা কর্‌তে পাচ্ছি না—আমাকে এখনই গিয়ে সুরেশকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে হবে।"

এই কথা বলিয়া নগেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার

বাবু ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই উঠিলেন। দ্রুতগতিতে তাঁহারা নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন। পৌছিয়াই সকলের সকলকে অতি বিনীতভাবে সে স্থান হইতে যাইতে বলিলেন। আরো এই জাল-নগেন্দ্রনাথের পরিচয় দিয়া কহিলেন—"এ অপর কেহ নয়, আমারই ভাই। আমি তাকে যখন ক্ষমা করেছি, তখন তোমারা এর উপর কোন অত্যাচার করতে পারবে না।"

এই কথা বলিয়া উপরে যে গৃহের মধ্যে সুরেশচন্দ্র আবদ্ধ ছিল, সেই গৃহের দরজা ঠেলিতে ঠেলিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"ভাই সুরেশ, তোমার কোন ভয় নাই। আমি থাকতে তোমার উপর কেউ কোন অত্যাচার করতে পারবে না, তুমি দরজা খুলে দাও।"

এই সময় গৃহের ভিতর একটা শব্দ শুনিয়া নগেন্দ্রনাথের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! এখন লোক জনের সেই কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, সুতরাং নগেন্দ্রনাথ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন যে, সেই গৃহের মধ্যে কে যেন গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। নগেন্দ্রনাথ তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া, জনকতক লোককে সেই দরজা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই, সে দরজাও ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। তখন সেই গৃহেরর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ দেখিলেন—সুরেশচন্দ্রের আসন্নমৃত্যু দেহ পড়িয়া রহিয়াছে!

নগেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইল না। দেখিতে দেখিতে সুরেশচন্দ্রের সেই পাপ জীবন-নাটকের যবনিকার পতন হইল!

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অচিরে এই সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সেই খগা-পাগলই প্রকৃত নগেন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্র—এ সংবাদ যে শুনিল, সেই বিস্মিত হইল! তাহার পর, সুরেশ-চন্দ্রের আত্মহত্যার কথাও আর গোপন রহিল না। তখন দলে দলে সেই ঘটনাস্থলে গ্রামের লোক আসিতে লাগিল। নির্ম্মলকুমারীর সতীত্ব এইরূপ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা হইতে দেখিয়া, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আর আনন্দের সীমা ছিল না। সতীর এই অপূর্ব্ব মহিমায় সকলেই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল! এই ঘটনায় সেই শ্যামা মুদিনীরও আজ আনন্দ যেন ধরে না, সে আনন্দে কালীঘাটের কালীমাতার পূজা মানসিক করিয়া ফেলিল!

নগেন্দ্রনাথের বাড়ী তখন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, কারণ যে এই অপূর্ব্ব ঘটনার কথা শুনিয়াছে, সেই দেখিতে আসিয়াছে। এখন সুরেশচন্দ্রের এইরূপ বিষ-পানে মৃত্যু সংবাদ পুলিশে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সে সংবাদ পাইয়া থানা হইতে একজন জমাদার ও দুই জন পাহারাওলা আসিয়া পৌছিয়াছিল। তাহারা উপস্থিত না হইলে, এ লোকের জনতা থামাইয়া রাখা ভার

হইত। বিশেষ পরিচিত বা আত্মীয় না হইলে, আর এখন কাহাকেও সেই বাড়ীর মধ্যে পুলিশের লোক প্রবেশ করিতে দিতেছিল না। সেই বাড়ীর সম্মুখেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা জমিয়া গিয়াছিল। কাহারও মুখে আর অন্য কথা নাই, তাহারা কেবল এই কথারই আলোচনা করিতেছিল। এখন এই পাগল সম্বন্ধেও নানা লোকে নানা কথা কহিতেছিল। একজন বলিল —"এই পাগলই যে, আসল নগেন্দ্র, এ কথা আমি অনেক পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছিলুম,—তবে আমার কথায় কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না বলেই, সে কথা এত দিন প্রকাশ করিনি।"

অপর একজন কহিল—"তোমার এ কথা ত ভাই, এখনও বিশ্বাস করতে পারি না। পাগলটা যে একটা বড় ঘরের ছেলে, এই পর্য্যন্তই বুঝ্‌তে পারা গিয়েছিল, সে আসল নগেন্দ্র বলে তুমি কি করে বুঝ্‌তে পার্‌বে?"

প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল—"সেদিনকার সেই গঙ্গাস্নানের ঘটনায় আমি বুঝ্‌তে পেরেছিলুম্‌—আর পেরেছিলুম এই নির্ম্মল-কুমারীর ব্যবহার দেখে। অমন সতী লক্ষ্মী যখন এই স্বামীর কাছে এলো না, তখনই আমার মনে হয়েছিল এ ত আসল স্বামী নয়!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন বলিল—"আচ্ছা, নির্ম্মলকুমারী এই জাল নগেন বাবুকে ত কখন নিজের চক্ষে দেখে নাই, না দেখে কি করে জান্‌তে পারলে ভাই?"

তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"যে যথার্থ সতী হবে, সে মনে মনে ঠিক জান্‌তে পার্‌বে। তার মনই তাকে সকল কথা বলে দেবে। এ ঘটনাটা কিন্তু ভাই বড় আশ্চর্য্য ঘটনা!"

সেই জনতার মধ্যে এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গেটের সন্নিকটে একটা ভয়ঙ্কর চীৎকারের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। একজন স্ত্রীলোক অন্য একজন স্ত্রীলোকের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"দে আমার ডিক্রী দে—এখনই—দে কোথায় আমার ডিক্রী রেখেছিস্ দে।" আর সেই প্রহারিতা স্ত্রীলোক বিকটস্বরে উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার ছাড়িতেছে—"ওলো পোড়ার-মুখী—ভাগলাগী—আঁটকুড়ীর ঝি—আমায় মেরে ফেল্লি লো! ওগো ডিক্রী ডিক্রী করে একেবারে ক্ষেপে গেছে গো! ওগো তোম্‌রা একে ধরগো—আমার প্রাণ যায় গো। আবর্! পোড়ার মুখো মিন্সেরা কেউ যে ধরে না গো—তাদের ঘরে মড়া মরুক গো—তাদের মেগেরা রাড় হ'ক গো!"

এইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে অপূর্ব্ব সুরে সেই প্রহারিতা স্ত্রীলোক সকলকে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছে—আর এদিকেও দমাদম্ প্রহার খাইতেছে—প্রহারের লঘুগুরু অনুযায়ী ক্রন্দনের সুরেরও লঘুগুরু হইতেছিল। প্রথমে সকলে বিস্মিত হইয়া এই ঘটনা দেখিতেছিল। তাহার পর সেই প্রহারিতা স্ত্রীলোক উপস্থিত সকলকেই গালি দিতেছে দেখিয়া, কেহই তাহার সাহায্যার্থে গেল না। আর যাইবেই বা কে? এইরূপ প্রহারে তাহারা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। যে স্ত্রীলোক প্রহার করিতেছিল, অনেকেই তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তাহার এখন আর কোন সাহায্যের আবশ্যক ছিল না। প্রহারিতা স্ত্রীলোক এই বার সে প্রহারে অস্থির হইয়া আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। তখন প্রহার-

কারিণী স্ত্রীলোক তাহার পৃষ্ঠের উপর বসিয়া 'হোঃ-হোঃ' শব্দে একটা বিকট হাস্ত করিল! সে হাসি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই শিহরিয়া উঠিল! এ স্ত্রীলোক উন্মাদিনী নাকি? যাহারা সে স্ত্রীলোককে চিনিত, তাহারাও একবারে বিস্মিত হইয়া রহিল! উন্মাদিনীর বিকট হাস্ত থামিলে কহিল—"আমার কেমন সিংহা-সন হয়েছে দেখ! আমি রাজা হয়ে এখন এই সিংহাসনে বসেছি। তোমরা কি সব খাজনা দিতে এসেছ? আচ্ছা দিয়ে যাও, দিয়ে যাও—খুব টাকা দাও; হুড়হুড় করে টাকা ঢাল না? আমার এত টাকা কোথায় গেল! অ্যাঁ-অ্যাঁ—আমার যে গহনার বাক্স কোথায় গেল! কে আমার এ সর্ব্বনাশ করলে!"

এইবার সেই উন্মাদিনী ক্রন্দন আরম্ভ করিল। স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অসংখ্য লোক তাহাই দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সেই উন্মাদিনী কহিল—"কই আমার ডিক্রি! যার জন্ত সব গেল—আমার সেই ডিক্রি! আমি ত এখন একবারে রাজরাণী হয়ে বসেছি। প্রসন্ন মুখুয্যের মেয়ে আমি—আমার বিষয়—আমার! বাড়ী—নগেন কে? সব আমার—সব আমার। এক তিল আমি কাকেও দেবো না—এ প্রাণ থাক্‌তে দেবো না—প্রাণ গেলেও দেবো না। হাঃ হাঃ হাঃ—"

উন্মাদিনী আবার বিকট স্বরে হাসিল! আর উন্মাদিনীই বা বলি কেন? বলা বাহুল্য—যে, এই উন্মাদিনীই আমাদের সেই মুক্তকেশী! টাকার শোকে ও পিতৃসম্পত্তির নৈরাশ্যে একবারে উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে! আর উন্মাদিনী মুক্তকেশী যাহার

পৃষ্ঠের উপর তখন বসিয়া আছে—এ সেই তাহার আদরের শিরোদাসুন্দরী। এখন হইতে তাহার পাপের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। মুক্তকেশী এবার অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিল। তাহার পর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"সব কেমন করে দখল করে নিয়েছি! বা হাইকোর্ট—সাবাস্ জজ সাহেব! প্রাতঃবাক্যে চিরজীবী হয়ে তুমি বেঁচে থাক। আজ আমার বাড়ীতে এত লোক কিসের জন্ত এসেছে? সব তাড়িয়ে দেবো—সব তাড়িয়ে দেবো। এই চল্লুম।"

এই বলিয়া মুক্তকেশী বাড়ীর দিকে দৌড়িয়া গেল। সদর দরজায় যে পাহারাওলা ছিল, সেও তাহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। মুক্তকেশী সেই দৌড়ে একবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনও নগেন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া সেই গৃহে বসিয়াছিলেন, এবং অশ্রুজলে সে দেহ সিক্ত করিতেছিলেন। সুরেশচন্দ্রের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে নগেন্দ্রনাথ তাহার সমস্ত অপরাধ একবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথের এইরূপ ব্যবহারে উপস্থিত সকলেই মনে মনে তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন। যাহাতে এই মৃতদেহের সৎকার হয়—পরীক্ষার জন্ত হাঁসপাতালে যাহাতে লইয়া যাইতে না হয়, নগেন্দ্র যখন এই সকল ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই মুক্তকেশীর উন্মাদিনী মূর্ত্তি নগেন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! মুক্তকেশী সুরেশচন্দ্রের মৃতদেহ গৃহতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া একটা বিকট হাস্ত করিয়া কহিল,—"মরেছে—মরেছে—আপদ গেছে! আমার সঙ্গে যে লাগ্‌বে—সেই মর্‌বে। হাঃ! হাঃ! হাঃ! মা কালীর পূজো দিতে হবে।"

নগেন্দ্রনাথ মুক্তকেশীর সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন—"এ আবার কি?" কালীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি কহিলেন—"এও এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন আবার কি হবে? যে যেমন কাজ করে, এ পৃথিবীতে তাকে তেম্নি ফল ভোগ কর্‌তে হয়।"

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন—"এ যে বড় ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত। আমি পাগলের ভান করে বুঝ্‌তে পেরেছি—পাগল হওয়া অপেক্ষা মহা-পাতক আর নাই!"

তাহার পর তিনি মুক্তকেশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"তুমি কি চাও?"

উন্মাদিনী অনেকক্ষণ নগেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর এক উচ্চহাস্য করিয়া কহিল—"তুই সেই পাগল নয়—তাই একথা আমায় জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিস্! আমি আবার চাইবো কি রে? আমার বাড়ী—আমার ঘর—আমার বিষয়—আমার সম্পত্তি—আমারই সব। দূর পাগল—দূর পাগল—দূর পাগল—আমি আবার চাইবো কিরে? তুই কি চাস্ বল্। আজ আমি কুইন্ ভিক্টোরী হয়েছি—যে যা চাইবে, তাকে তাই দেবো। যে রাজ্য চায়—তাকে রাজ্য দেবো—যে রাজকন্যা চায়, তাকে রাজকন্যা দেবো—যে হাতী চায়, তাকে হাতী দেবো—যে ঘোড়া চায়, তাকে ঘোড়া দেবো। কেবল আমার ডিক্রীখানা কাকেও দিতে পার্‌বো না! এ্যাঁ—এ্যাঁ—আমার সে ডিক্রী কোথায় গেল? এ সেই ফিরী পোড়ার মুখীর কাজ—যাই তার শ্রাদ্ধ আমি করিগে!"

এই বলিয়া উন্মাদিনী আবার উর্দ্ধশ্বাসে সে গৃহ হইতে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল। নগেন্দ্রনাথ এই উন্মাদিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসার ভার তৎক্ষণাৎ একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর উপর অর্পণ করিলেন।

—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বুধবার। আজ অতি প্রত্যুষেই নির্ম্মলকুমারী স্বামী-গৃহে নিজেই আসিয়াছে। নগেন্দ্রনাথের লইয়া আসিবার বিলম্ব তাহার আর সহ্য হইল না। নির্ম্মলকুমারীকে দেখিয়া দাস দাসীগণের আর আনন্দের সীমা ছিল না। কামিনী ঝিও আনন্দে একবারে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। গুরুচরণেরও চক্ষু ছলছল্ করিতে লাগিল। রামচরণ বেহারা 'মাজী আয়া' বলিয়াই আহ্লাদে একটা লম্ফ প্রদান করিল। বৃদ্ধ দারবান্ তেয়ারী ঠাকুর আনন্দে অন্য এক যুবা মিশ্রঠাকুরের সহিত কুস্তী লড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। আর এত কালের পর স্বামীগৃহে স্বামীকে পাইয়া নির্ম্মলকুমারীর কি আনন্দ হইল না? নির্ম্মলকুমারীর আনন্দ হইল বটে, কিন্তু গত কল্য সুরেশচন্দ্রের অপঘাত-মৃত্যুর দরুণ, নির্ম্মল আজ আর সে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিল না। দাসদাসীগণের প্রণাম গ্রহণ করিয়া, প্রথমেই নির্ম্মলকুমারী যে ঘরে পতিবিয়োগকাতরা কমলা পড়িয়াছিল, সেই গৃহে উপস্থিত হইল। নির্ম্মলকুমারীকে দেখিয়া কমলা একবারে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! তখন নির্ম্মলকুমারীও চক্ষের জল আর রাখিতে পারিল না। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তাহার পর স্নেহপূর্ণ সান্ত্বনাবাক্যে

নির্ম্মল কহিল—"যা হবার তাত হয়ে গেছে, এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে বোন্?"

কমলা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"ওগো, আমার কোন উপায়ই যে সে করে যায়-নে। আজ তুমি তাড়িয়ে দিলে, আমি কোথায় দাঁড়াবো?"

নির্ম্মল। ও কি কথা ছোট-বউ! অমন কথা কখন মুখে এনো না। আমি তোমায় ছোট বোনের মতন দেখ্‌বো। তুমি এ বাড়ীতে যে ভাবে ছিলে, ঠিক্ সেই ভাবে থাক্‌বে আমি এখন থেকে সংসারের সব ভার তোমার হাতে দেবো। আর সংসারেই আমার কে আছে বল? এক ঠাকুর-ঝি ছিল, এখন শুন্‌ছি তিনিও নাকি পাগল হয়ে গিয়েছেন। তুমি যাকে যা কর্‌তে বল্‌বে, সে তাই কর্‌বে—তুমি যাতে সুখী হও, আমি প্রাণপণে তাই কর্‌বো।

কমলা। ওগো, সুখ আর আমার অদেষ্টে কি আছে? তা থাক্‌লে আমার আজ এমন দশা হবে কেন? আমার ভগিনী-পতিই ত আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে—জেনে শুনে একটা জালিয়াৎ লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছে!

নির্ম্মল। অমন কথা মুখে এনো না বোন। স্বামীনিন্দা কর্‌লে স্ত্রীলোকের মহাপাতক হয়। আর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ত ভগবানের হাত, এ বিষয়ে অন্যকে দোষ দিতে নাই।

কমলা। যতদিন বাঁচবো—ততদিন দেবো। এর চেয়ে একটা দুঃখীর ঘরে বিয়ে দেওয়া ভাল ছিল। প্রথমে এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, না জানি শেষে আমার অদেষ্টে কত দুঃখভোগই ভগবান লিখেছেন।

বলিতে বলিতে কমলা পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মল

তাহাকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সেই গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিলেই, কামিনী-ঝি তাহাকে তাড়াতাড়ি কহিল—"বউ-মা, বাবু তোমায় ডাক্‌ছেন। এই সাম্‌নের ঘরে আছেন—তুমি একবার শীগ্‌গির যাও।"

কামিনীর কথা শুনিয়া নির্ম্মলকুমারীর হৃদয় গুর্‌ গুর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! স্মৃতিসাগর আলোড়িত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কত কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নির্ম্মল ধীরে ধীরে অতি ধীরে সেই গৃহের দিকে চলিল। দরজার সন্নিকটে গিয়া তাহার পা আর চলে না। অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ তখন নির্ম্মলকুমারীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে,সে লতা যেমন তৎক্ষণাৎ আকুঞ্চিত হইয়া যায়, বহু কালের পর স্বামীর স্পর্শে নির্ম্মলকুমারীর রোমাঞ্চিত দেহ সেইরূপ আকুঞ্চিত হইয়া গেল! কিছুক্ষণ কাহার মুখে কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। তাৎকালিক দম্পতিযুগলের মনের অবস্থা বুঝি ভাষায় প্রকাশিত হইবার নহে। ভাষায় প্রকাশিত না হউক, চক্ষের জলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না কি? ঐ দেখ—কিছুক্ষণ পরেই উভয়ের চক্ষেই আনন্দ অশ্রু দেখা দিল। অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে কাঁদিল—কতক্ষণ তাহা আমরা বলিতে পারিব না। তাহার পর, প্রথমেই নির্ম্মলকুমারী প্রকৃতিস্থ হইল। কি মনে করিয়া আপনার অঙ্গের বস্ত্রাদি যথাস্থানে স্থাপিত করিল। তাহার পর, ধীরে ধীরে কহিল—"অনেক দিন ত

দেশে এসেছ, এতদিন পাগলের ভান করে কেন বৃথা কষ্টভোগ করলে?"

নগেন্দ্রনাথ চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন—"তোমার জন্যই আমি পাগলের ভান করেছিলাম নির্ম্মল।"

নির্ম্মল। আমার জন্য! কেন আমি কি অপরাধ করেছি?

নগেন্দ্র। তোমার কোন অপরাধই নাই,—অপরাধী আমি। আমি প্রথমে যে সকল কথা শুনেছিলুম, তাতে তোমার চরিত্র সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হই। কিন্তু এখানে এসে স্বচক্ষে দেখলুম—তুমি যে নির্ম্মল, সেই নির্ম্মলই আছ।

নির্ম্মল। তবে তখনই পরিচয় দিলে না কেন?

নগেন্দ্র। সে তোমার আরো পরীক্ষা করবার জন্য। আজ মুক্তকণ্ঠে বলছি—তুমি আমার সকল পরীক্ষায় সম্পূর্ণ জয়ী হয়েছ।

নির্ম্মল। আমি বড় হতভাগা—আমারই জন্য তুমি পাগলের ভান্ করে কি কষ্টই না ভোগ করেছ!

নগেন্দ্র। না নির্ম্মল, কষ্টভোগ কিছুই করি নাই; বরং অতুল আনন্দভোগ করেছি। তোমার কথা মনে হলে, আমি আনন্দে পাগল হয়ে যেতুম। তখন লোক-লজ্জার ভয় থাক্‌তো না, আমি পাগল সেজে আনন্দে নেচে-কুঁদে বেড়াতুম। যে আনন্দে মানুষ একবারে উন্মত্ত হয়ে যায়, আমি সেই আনন্দই ভোগ করেছি।

নির্ম্মল। আর সময়ে খেতে পেতে না—কতদিন গাছতলায় রাত কাটিয়েছ, কত লোকে তোমায় ঘৃণা করে তাড়িয়ে দিয়েছে—এও কি তোমার আনন্দভোগ নাকি?

নগেন্দ্র। তবে আমিও বলি। আমার ত এ সংসারে তুমি

ভিন্ন আর কেউ নাই, কিন্তু তুমি তোমার জনক-জননীর কাছে কি সুখে ছিলে নির্ম্মল? তুমি কেবল আমারই জন্য সে সকল কষ্টভোগ করেছ—যখন আমার মনে সে কথার উদয় হতো—আমি সে সব কষ্ট ভুলে গিয়ে, আনন্দে একবারে অধীর হয়ে পড়্‌তুম্। সে আনন্দে নেচে গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াতুম্। যাক্ এ সকল কথা। নির্ম্মল, তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌লে কি করে?

নির্ম্মল। মা জাহ্নবী আমায় চিনিয়ে দিয়েছেন। সে কথা এখনও আমার মনে হলে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হয়! আমি ত গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌তে গিয়েছিলুম, তার পর যখন আমার একটু একটু জ্ঞান হচ্ছিল, তখন মা-জাহ্নবী আমার কানে কানে বল্লেন,—'চেয়ে দেখ্ নির্ম্মল, ঐ তোর স্বামী।' তার পর চোক চেয়েই তোমায় দেখ্‌তে পেলুম।

নগেন্দ্র। আর তুমি জীবিত হয়েছ দেখে, ধরা পড়বার ভয়ে আমি তখন দৌড়ে পালিয়ে গেলুম্! সে কাজটা ত আর পাগলের মত কাজ হয় নাই।

নির্ম্মল। এ সকল কথা এখন থাক। এখন তোমায় একটি কথা বল্‌বো?

নগেন্দ্র। আমায় কোন কথা বল্‌তে তুমি এত 'কিন্তু' হচ্ছ কেন নির্ম্মল?

নির্ম্মল। ছোট বউ ত এখন হতে আমার ছোট বোনের মতন এ বাড়ীতেই থাক্‌বে। ঠাকুর-ঝি যাতে ভাল হন, সে বিষয়েও আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌তে হবে। আর একটি কথা তোমায় আমি অনুরোধ ক'র্‌ছি—আমি বড় লোক ভালবাসি—যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব কর্ত্তার আমলে এই বাড়ীতে থেকে প্রতিপালন

হয়েছে, এখন তাঁদের তোমায় এ বাড়ীতে আন্‌তে হবে। শুনেছি—তাঁহাদের অনেকেরই নাকি বড় কষ্ট হয়েছে।

নগেন্দ্র। এ অনুরোধ কর্‌তে তুমি এত কিন্তু হচ্ছিলে কেন নির্ম্মল? এ অনুরোধ তুমি না কর্‌লেও, আমি এ কাজ কর্‌তুম। একবার বাহিরে যাবার বিশেষ আবশ্যক আছে। তোমার আর কোন কথা এখন বল্‌বার আছে কি?

নির্ম্মলকুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—"না"

নগেন্দ্রনাথ পুনরায় নির্ম্মলের মুখ চুম্বন করিয়া সে গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মলকুমারীর মনোবাসনা পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। মুখুর্য্যে-বাড়ী আবার আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আবার 'কাক সমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়' দিবারাত্র কলকলধ্বনিতে সেই প্রকাণ্ড বাড়ী প্রতিধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নির্ম্মল-কুমারী যাহা চাহিয়াছিল, তাহার অধিক পাইয়াছে। যে সকল আত্মীয়-স্বজন পূর্ব্বে এ বাড়ীতে আশ্রয় পায় নাই, এবার তাহা-রাও আশ্রয় পাইয়াছে। নির্ম্মলকুমারীর যত্নে সকলই স্বভাবসুলভ কলহাদি ভুলিয়া গিয়া, বাঘিনী ও হরিণীর একত্র বাসের ন্যায়, বিনা কলহে এতগুলি স্ত্রীলোক একত্রে বাস করিতেছে। এমন কি সুরেশচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী কমলাকেও এখন নির্ম্মলকুমারী আপনার করিয়া লইয়াছে। যে ভাল হয়, সে মন্দকেও ভাল করিয়া লইতে জানে।

আর জানকীনাথ? সেই নিরেট-বোকা অথচ ভীষণ খলস্বভাব, সেই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অথচ সব-জান্তা, সেই রূপগুণ-গর্ব্বিত অথচ সৃষ্টির অপূর্ব্ব জীব—আমাদের জানকীনাথ এখন কোথায়? জানকীনাথও এখন এই বাড়ীতেই থাকে। নির্ম্মলকুমারীর কি যে মোহিনীশক্তি আছে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু নির্ম্মল-কুমারীর যত্নাতিশয্যে এই অদ্ভুত জীবও তাহার বশীভূত হইয়া

পড়িয়াছে। একদিন কামিনী-ঝি নির্ম্মলকুমারীকে দূর হইতে দেখাইয়া জানকীনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—"জান্‌কে, উনি তোর কে হয় বল্‌দেখি ?"

জানকীনাথ একবারে দন্তপাটি বাহির করিয়া মুখভঙ্গিমার সহিত উত্তর করিল—"জানি না নাকি—আমার মাসী হয়।"

কামিনী হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া কহিল—"মাসী কিরে সর্ব্বনেসে, উনি যে তোর দিদি হয়।"

জানকীনাথ তখন একটু রাগত হইয়া কহিল "কেন—দিদি হলে বুঝি আর মাসী হতে নেই ? তবে আমার মার দিদিকে আমি মাসী বলে ডাকি কি করে ?"

কামিনী তখন একটু রঙ্গ করিবার জন্ত কহিল—"হাঁরে জান্‌কে, তোর পিসী নাকি তোকে 'বাবা' বলে ডাক ?"

কামিনীর এই কথায় জানকীনাথের ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া গেল। ক্রোধভরে জানকীনাথ কহিল—"আমাকে বাবা বলে ডাক্‌বে কেন ? আমার বাবাকেই পিসী-মা 'বাবা' বলে ডাকৃত। আমায় ঠকাবে ? আমি জানি না নাকি ?"

নির্ম্মলকুমারী তখন অদূরেই ছিল, কামিনীকে এইরূপ রঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া জানকীকে কহিল,—"আয় জানকী, সন্দেশ খাবি আয়।"

এই এক কথায় জানকীনাথের ক্রোধ একবারে জল হইয়া গেল ! জানকীনাথ হাসিতে হাসিতে ও নাচিতে নাচিতে তখন সন্দেশ খাইতে দৌড়িল !

মুক্তকেশীর উন্মাদ রোগের এখনও কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। সে এখনও 'ডিক্রী ডিক্রী' করিয়া মধ্যে মধ্যে চীৎকার ছাড়িয়া

থাকে। কখন বা রাজরাণী হইয়া নায়েব-গোমস্তা প্রভৃতিকে ভর্ৎ-সনা করে, আবার কখন বা আপনাকে ভিখারিণী মনে করিয়া কাঁদে। তাহাকে একটা গৃহের মধ্যে এখন আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তবে মধ্যে মধ্যে সে গৃহ হইতে সে পলাইয়াও যাইত। একবার ছাড়া পাইলেই সে তখন ক্ষিরোদার বাড়ী গিয়া তাহার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। শেষে মুক্তকেশীর অত্যাচারে ক্ষিরোদা বাড়ী-ঘর পরিত্যাগ করিয়া, বেহালায় তাহার জামাতার গৃহে গিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

তাহার জামাতা নীলমণির অবস্থার এখন বিশেষ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। পাপের ধনে সে এখন স্বগ্রামে দ্বিতল বাড়ী এবং অনেক ধন-সম্পত্তি করিয়া সুখে কাল কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সকল পাপীর শাস্তি এ পৃথিবীতে হয় না। এ পৃথিবীতে এমন অনেক নীলমণিও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, নীলমণি শিবপুর গ্রামে আর প্রাণ থাকিতেও আসিত না।

অভয়াচরণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনী এখন সেই নিদারুণ পুত্রশোকের যন্ত্রণা হইতে কতকটা শান্তিলাভ করিয়াছেন। শোক কখন চিরদিন সমভাবে থাকে না। ডাক্তার বাবু এখন নিজ ব্যবসায়েরও বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন, আর সৌদামিনীও পরিমিত ব্যয় করিয়া এখন সঞ্চয় করিতে শিখিয়াছে। সৌদা-মিনী মধ্যে মধ্যে তাহার ভগিনী কমলাকে দেখিতে নির্ম্মল-কুমারীর বাড়ীতে যাইত। এক দিন বৈকালে এইরূপ বেড়াইতে আসিয়া, কথায় কথায় নির্ম্মলকুমারীকে সৌদামিনী কহিল—"নির্ম্মল, তুমি ধন্য মেয়ে বোন্, এত দাসদাসী থাকতে, তুমি রাত্রিদিন খেটে খেটে তোমার শরীর নষ্ট করতে বসেছ।"

নির্ম্মল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল—"মেয়ে-মানুষ ত খাটবার জন্যই জন্মেছে দিদি। আর আমার সংসারে আমি খাটবো না ত কে খাটবে ?"

সৌদামিনী। আর শুধু কি খাটা ? তোমার অনেক গুণ। তুমি নিজের সংসার বল্‌ছ—কিন্তু ও সংসারে ত তুমি দাসীর মতই আছ। সংসারের খরচপত্রের ভার তুমি ত সব কমলের হাতে দিয়েছ। নিজের সংসারে এমন কি কেউ পারে ?

নির্ম্মলকুমারী যেন কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল—"সে কি কথা বল দিদি ? ওর মতন দুর্ভাগিনী আর কে আছে ? ও এই বয়সেই বিধবা হয়েছে। এখন ওকে একটা কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত থাকতে দেওয়াই ভাল। আর টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করলে মনটাও একটু ভাল থাকে।"

সৌদা। যা হ'ক—তুমি আমার যে উপকার করেছ—আমি এ প্রাণ থাকতে তা ভুলতে পারবো না। তুমি আমার বোন্‌কে কেমন সুখে রেখেছ—আমার অমন হতভাগা ভাইটাকে—যার জ্বালায় আমি একেবারে অস্থির হয়েছিলুম—মায়ের পেটের ভাই হলেও যাকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠ্‌তো—তাকেও তুমি বশীভূত করেছ। সে আর আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় যায় না—তাকে তুমি এতদূর বশ করলে কি করে ?

নির্ম্মল। যত্ন করলে বনের পশুও যে বশ হয় দিদি।

সৌদা। নিজের ভাই হলে কি হবে, সে যে বনের পশুরও অধম !

এমন সময় সেই পশ্বাধম জানকীনাথ তথায় উপস্থিত হইল। সে তখন হাসিতে হাসিতে কি কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল,

কেহ তাহা স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু জানকীনাথ আসিয়াই কহিল,—"দিদি, আমি আর তোর বাড়ী যাবো না। তুই আমায় নিয়ে যেতে এসেছিস্ নাকি?"

সৌদামিনী উত্তর করিল,—"তোকে নিয়ে যাবার জন্য ত আমার ঘুম হয়-নি।"

বিকট মুখ-ভঙ্গিমার সহিত ক্রোধভরে জানকীনাথ কহিল—"ঘুম হয়-নে! তবে ডাক্তার বাবুকে ওষুধ দিতে বল্‌তে পারিস্‌নে?"

নির্ম্মলকুমারীকে ইঙ্গিত করিয়া সৌদামিনী কহিল—"একবার রকমখানা দেখেছ?"

নির্ম্মল জানকীনাথকে কহিল,—"আয়রে জানকী, পয়সা নিবি আয়।"

জানকী অমনি মন্ত্রবশীভূত সর্পের ন্যায় সুড়্‌সুড়্ করিয়া নির্ম্মলকুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সৌদামিনী তখন অবাক্ হইয়া রহিল।